# ভাগরিয়া

চোদ্দ বছর শারদীয়া ঃ ১৩৭৬

# উৎসবে কেনাকাটার জন্যে

## আমাদের শো-রুমে আসুন

৪৫ নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ ( নীচতলা )

হাতের তাঁতে বোনা রেশম ও সূতির

রকমারী শাড়ী * সার্টের কাপড়

* বিছানার চাদর * বেডকভার * স্কার্ফ

* গৃহসজ্জার বস্ত্র ও উপকরণ

ঐতিহ্যপূর্ণ বিবিধ হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল আয়োজন

: শাখাসমূহ :

কুচবিহার * শিলিগুড়ি ( হিলকার্ট রোড )
জলপাইগুড়ি ( শিল্প সমিতি পাড়া )
মালদহ * সিউড়ি * পুরুলিয়া * মেদিনীপুর
( বড়বাজার ) * রাউড়কেল্লা ( সপ নং ৩,
সেক্টর ৫ ) * দুর্গাপুর ( ষ্টীল মার্কেট,
সপ নং ৪৫, দুর্গাপুর-৫ * নিউদিল্লী
( ৭০ থিয়েটার কম্যুনিকেশন্ বিল্ডিং-জনপথ )

## দি ওয়েষ্টবেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা )

৪৫ নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,

কলিকাতা-১৩

# জাগরীর

## গ্রাহক হ'তে হলে···

যে কোন সময় থেকে জাগরীর গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহক-গ্রাহিকারা তাঁদের দেয় চাঁদার মধ্যেই দু'টি বিশেষ সংখ্যা পাবেন; একটি শারদীয়া ও অন্যটি নববর্ষ (বৈশাখ)। সংখ্যা। প্রতি ইংরেজী মাসের ১৫ই তারিখ নাগাদ প্রতি মাসের পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

● কয়েকটি জায়গায় এখনও কিছু এজেন্ট দরকার। এজেন্সী নিতে হলে কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়মকানুন জেনে নিতে হবে।

## লেখক হতে হলে···

● পরিচ্ছন্ন রুচিশীল কবিতা, গল্প, রম্য-রচনা ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

● প্রেরিত লেখার সঙ্গে মনোনয়ন সংবাদ কিম্বা অমনোনীত হলে ফেরৎ পাঠাবার জন্য অবশ্যই ডাকটিকিট সঙ্গে দিতে হবে। তিনমাসের আগে মতামত জানানো সম্ভব নয়।

**জাগরী :** ৯এ, হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩। ফোন : ৫৫-৬০৩৩

—বিঃ দ্রঃ—

'জাগরী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' ও 'যুব-সম্মেলনে'র সঙ্গে যুক্ত হতে চান তারা 'জাগরীর' ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

P 295-98

শ্রীঅরবিন্দের বাণী ২১০

কবিতায়

| | | |
|---|---|---|
| মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত | ২১১ | আবার সূর্য |
| অমরশঙ্কর দত্ত | ২১২ | ভ্রমণ |
| অপূর্বকুমার সাহা | ২১৩ | সেদিন পর্যন্ত |
| অমিতাভ চৌধুরী | ২১৯ | ছুটি ছড়া |
| অনিলকুমার সমাজদার | ২১৫ | বিশ্বটা নরকো মায়া |
| বলরাম সিংহ | ২১৭ | সৈকতে |
| অজিত চক্রবর্তী | ২১৯ | দুপুরের গুঞ্জনে |
| দীপালি বল | ২১৪ | ক্ষণিকের বিপ্লবে |
| সুনীলাংশু দাশ | ২১৯ | বহতা জীবন |
| শহিদুল হক | ২১৮ | গরমিল |
| শ্রাবণী দে | ২১৮ | আলোছায়া |
| সরোজকুমার দত্ত | ২১৬ | ধ্রুব |

নিবন্ধ, গল্প ও রম্য-রচনায়

| | | |
|---|---|---|
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ২২১ | দশভূজার পূজা |
| নলিনীকান্ত গুপ্ত | ২২৭ | দেশে, কত দূরে... |
| পশুপতি ভট্টাচার্য | ২৩৩ | কৃতজ্ঞ চওয়া |
| সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৭৪ | অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকারে |
| রঘুপতি বসু | ২৮০ | কবর |

| | | |
|---|---|---|
| দেবদাস ভট্টাচার্য | ২০৭ | সাহিত্যে শ্লীলতা। |
| | | অশ্লীলতার প্রশ্ন |
| বিমল কর | ২১১ | আত্মহত্যা |
| পার্থ চট্টোপাধ্যায় | ২১৯ | ডাকাতি |
| তুষারকান্তি বে | ২২৩ | রাম সিংহ |
| তুষার পটীম দেববর্মন | ২২৭ | আমার সঙ্গীত |
| | | জীবন কথা |
| এ. আমিনিউদ্দিন | ২৩০ | মেসিনের সঙ্গে ভারতীয় |
| | | বিপ্লবীদের যোগসূত্র |
| অমিতকুমার দত্ত | ২৩৬ | চলচ্চিত্র ও সমাজ |
| বৈদ্যনাথীবালা | ২৩৮ | নুড়োর ঘানে ঘ'লে |
| সবকুমার শীল | ২৭১ | মায়ার আসর |
| | ২৭৩ | মৌজিম অন্যাদেত্ত |


নারী-ভীর্থ

—•—

আমাদের পূজার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন



পাইওনিয়ার স্প্রিং এণ্ড ষ্টীল
কনসার্ণ প্রাইভেট লিমিটেড



২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১

…শক্তি চতুষ্টয়—মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী।

রাজরাজেশ্বরী মহেশ্বরী আসীন মানস তর্কবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির উপরে বৃহতের মধ্যে—এ দুটি বৃত্তিকে তিনি শোধন ক'রে মহত্তর ক'রে জ্ঞানের ও বিশালতার মধ্যে উন্নীত করেন, কিংবা তাদের অনধিগম্য এক জ্যোতির প্লাবনে তাদিকে ভরে দেন। কারণ তিনিই সেই শক্তিময়ী, জ্ঞানময়ী যিনি আমাদিগকে উন্মুক্ত করে ধরেন অতিমানস আনন্ত্যসকলের, বিশ্বব্যাপী বিশালতার দিকে, পরম-জ্যোতির মহৈশ্বর্য্যের দিকে, অলৌকিক জ্ঞান ভাণ্ডারের দিকে, মায়ের চিরন্তন বল ধারার অপ্রমেয় গতি-ছন্দের দিকে।……

তাঁর একমাত্র কাজ হল বস্তুর সত্যকে নিয়ে, তাঁর শক্তির-কেন্দ্র হল জ্ঞান আর আমাদের অন্তরাত্মকে আমাদের প্রকৃতিকে ভাগবত সত্যে নির্মাণ করা হল তাঁর ব্রত, তাঁর প্রয়াস।

—শ্রীঅরবিন্দ

চৌদ্দ বছর : আশ্বিন : ১২শ ও শারদীয়া সংখ্যা-১৩৭৬

# আবার সূর্য

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

দিনের পর দিন কুয়াশা আর অন্ধকার
অন্ধকার আর কুয়াশা রাতের পর রাত
দিন পেরিয়ে রাত পেরিয়ে মানুষগুলি ধুঁকতে ধুঁকতে
বুকের রক্তে স্বপ্ন দেখেছে প্রতি মুহূর্তে
সূর্য উঠবে, সূর্য উঠবে।

দিনের পর দিন অন্ধকারকে
ছিন্নভিন্ন করে বুকের রক্ত মাটিতে আকাশে বাতাসে
কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে—
নতুন ফসলে আবার দশদিক চোখ জুড়াবে,
মায়ের মলিন ললাটে আবার জয়তী টিপ;

চতুর্দিকের আবীরে নির্মেঘ আকাশ
জীবনের রঙ মাখতে মাখতে
ক্ষেত খামার কলকারখানা নিবেশ উপনিবেশের
খুশিকে প্রসারিত করছে ফাল্গুনের সূর্য,
দুঃস্বপ্নের ঘোরে মানুষ আবার
প্রাণভরা নিশ্বাস নিতে চাইছে

সূর্যের আলো মাখতে চাইছে শরীরে,
আবার সূর্য চাই প্রদীপ্ত সূর্য
উষ্ণতা, প্রাণ
মানুষগুলি আবার নিশ্বাস নিতে চাইছে
নিশ্বাস,
প্রতিশ্রুতির নিশ্বাস ॥

## ভ্রমণ

অমরশঙ্কর দত্ত

দৃশ্যতঃ দু'পায়ে হাঁটছি
কিন্তু জানি
এক-পা বাহিরে আছে
অন্য পা রেখেছি আমরা
রক্তের ভিতরে।

# সেদিন. পর্যন্ত

অপূর্বকুমার সাহা

সেদিন পর্যন্ত আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে
এতদিনের মৃত্যুকে এক সারস্বতী মহিমায় উদ্ভাসিত করতে
বেঁচে আমাকে থাকতেই হবে সে দিন পর্যন্ত।
আলোর প্লাবনে শৈশব-উলঙ্গতায় আমি
নগ্ন হব, মগ্ন হব চিদানন্দ প্রভাস-ধূপে···
এতকালের কুড়িয়ে আনা চৈত্য-দীপ
তিল তিল করে জমিয়ে তোলা সঞ্চয়ে
সেদিন আলোময় হয়ে উঠবে ··সার্থক হবে
এতকালের ব্যর্থতা···জগৎ যে কত ভাল···বাঁচায়ে কত
আনন্দের আমাকে বুঝতেই হবে সেই প্রভাতে।
অহংকৃত আয়নার মুখ দেবো, রূপকল্প ছায়ায়
বসে বাজাবো বাঁশী···দিগন্তের ধূসর বাউলতায়
বিছানো রোদ সোনার মতন···নিসর্গ-স্বপ্ন সম্ভাবনা
আমি অমরার সন্ধান পাব। অহং-এর সার্থকত্ব
বুঝবো এক বিরাট সত্যের অবয়বে
সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতেই হবে আমাকে।

# ক্ষণিকের বিপ্লবে

দীপালি বল

ঘন কালো-জলভরা মেঘ,—উঠেছে ক্ষেপে,
তীব্র তার জ্বালা—ছোটে এদিকে, ওদিকে।
তালগাছ, নারকেল গাছের মাথাগুলি
ফ্যাকাশে সাদা,—ওরা বিহ্বল—এক অজানা
বিপ্লব আসবে ভেবে।

বকগুলি উঁচুতে, কালো মেঘের পাশে,
ঘুর্ণী দিয়ে ঘুরে বেড়ায়——বাঁধন হারা--
শান্তির দূত কী ওরা?

বৃষ্টি!

কিছুই দেখা যায় না—
শুধু সাদা আর সাদা ক্ষুব্ধ জল,—
মাছরাঙা পাখীগুলি খুশীতে উথেল,

নেমে এসেছে,

গাছ ছেড়ে, আকাশ ছেড়ে—পুকুরের পারে,
বৈষয়িক আশা নিয়ে—মাছ ধরা।

বৃষ্টি থামলো—

চারিদিকে জল আর জল—প্লাবন?—না।
পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতা ক্ষণিকের বিপ্লবে।

# এ বিশ্বটা নয়কো মায়া

অনিলকুমার সমাজদার

পণ্ডিতেরা বলে : পৃথিবীটা মিথ্যা-কেবল-মায়া
মরীচিকার মতই যতই যাবে, লুপ্ত হয়ে কবে।
নয়তো দেহ মাত্র শুধু অশরীরী ছায়া
বোঝাতে চায় তর্কে। তবু কেমন করে হবে?

প্রলয় অন্ধকারে, যখন একলা ছিলে তুমি
সঙ্গীবিহীন জড়ের মতন, ভাবলে সৃজনতরে—
দূর করে সব আঁধার, জলেই গড়লে তুমি ভূমি
ক্রমে ক্রমে তৈরী হ'ল বিশ্ব তোমার করে।
ইচ্ছা তোমার সৃষ্টিহেতু, রূপ নিল এই ভাবে,
জয়ের চিহ্ন "বিশ্ব" তোমার, নিশান গৌরবের
একেও যদি "মিথ্যা" "মায়া" বলতে ওরা চাবে—
দেখল নাকি শক্তি তোমার চক্ষে সংশয়ের!
ভালবাসার বস্তু তোমার "বিশ্ব" জানি, তবে—
তোমার গড়া ভুবন "মায়া" কেমন করে হবে?

# ধ্রুব

সরোজকুমার দত্ত

একটু স্থির হয়ে আমাকে বসে থাকতে দাও
অনেক ঢেউয়ের দোলা
বদিও পড়ছে আছড় খেয়ে
—তা' পড়ুক।
আমি আছি অন্তমনে
যেখানে আত্মার নিরাপত্তা প্রচুর।

কালো কালো উত্তাল নৈরাশ্যের ভার
পড়ছে ভেঙ্গে, হিমানীর শিখর ভাঙ্গার মত
—তা' পড়ুক।
আমি তবু চুপ করেই থাকি;
আকাশ কালো করে আসছে আসুক মেঘ
আমি তবু গান বেঁধে যাই।
কেউ তো জানেনা আজ
কি আছে আমার হাতে?
দেখ, আমি আজ পারি ক্ষমা করতে,
—ভালবাসতে
—দুঃখ সইতে
এই নিয়ে জেনো স্থির হয়ে আছি।

# সৈকতে

বলরাম সিংহ

অন্ধকার নেমে এল
রাঙামেঘ আকাশের নীলে ছড়াল আবীর
দুধসাদা পাখা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেল বক।
শান্ত এক নির্জনতা :—
সুপ্তির আস্বাদ তারে দেয় না রক্তিম লজ্জা—
আকাশে তারার আল্পনা,
সাগরের নীল জল সাদা ফেনা বুকে বয়ে
ছুটে আসে আর যায়।
ওই দূরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকা মন ঝাউবন
দুলে ওঠে সন্ধ্যার বাতাসে।
বুকে তার জোনাকিরা
শাড়ীর চুমকির মত জ্বলে আর নেভে
সৈকতে বালিতে শুয়ে ধীরে মোর চোখ দুটি তুলে
দেখেছি তার সন্ধ্যাদীপের মত দুটি চোখ।
বলেছি, তুমি ভোর বেলার পূব আকাশের রক্তিমতা
তুমি মনীষা, আমার মনীষা।
সৈকতের নির্জনতা, নীল সাগরের গান,অপার নীলিমা
সব কিছু মিলে যেন এক ছন্দিত কবিতা।
সে ছন্দের ব্যাপ্তি আমার হৃদয়ে
এঁকে দিল সবুজ প্রত্যয়।
এখানে আকাশে আছে দুরন্ত নীলিমা
অবধি চোখ মেলে চাওয়া।
এখানে বাতাসে আছে মুক্ত জীবনের স্বাদ
শুধু বয়ে যাওয়া।

# আলোছায়া

শ্রাবণী দে

নিস্তরঙ্গ নিঃসীমতায় পাখীর কলরব,
মর্ত্তলোকে মুঠো মুঠো প্রাণস্পন্দন ছড়িয়ে গেল
ছোট্ট আঙ্গিনায় দোপাটির রঙ বৈচিত্র
প্রজাপতির পাখায় কাঁপে দুলে দুলে ;
মরুভূমির বুকে এক চিলতে শ্যামলিমা,
ছোট্ট ঘাসের একটা শীষ,
আলোর দীপ্তিতে উজ্জ্বল পৃথিবী
কিন্তু জীবন আলোছায়ার নিবিড় রহস্যে ঢাকা
তাই নিঃসীম অন্ধকারে পাখীর ডাক স্তব্ধ,
স্তরে স্তরে ঝরে পড়ে অন্ধকার।
দোপাটির গর্বিত পাপড়ি খসে গেল,
ম্রিয়মাণ করুণ উদ্বেলিত রক্তের বেদনা।
মরুভূমি শুধু মরিচিকা ভরা,
তৃষ্ণার্ত কেঁদে গেল ওর অসীম চক্রান্তে।
জীবনের স্পন্দন মিথ্যে ব্যর্থ
হারিয়ে গেল অনন্ত বিলীনতায়।

---

# গরমিল

শহিদুল হক

সারাদিনের ক্লান্তদেহে হিসাব নিকাশ
লাভ লোকসানের পরিমাপ
করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠি উর্দ্ধশ্বাসে
কি দিয়েছি কি পেলাম কিই বা পাব হিসাব শেষে ?
ধরণীর এ হাটে যায় শুধু মাল কুরায়ে—
ক্লান্তি শ্রান্তি হতাশার অন্ধকারে উঠি ককিয়ে।
দিনের শেষে হিসাব দেখে কিইবা হবে
গরমিল শুধু গরমিল
আর কিছু নেই এ ভবে।

## বহতা জীবন

সুনীলাংশু দাশ

প্রয়োজন সেই কোনো বটবৃক্ষের
ছায়াসত্রে আছে শুধু মক্ষিরা
মাথার ওপরে ক্রমে ক্রমে
নেমে আসুক সূর্যের দগ্ধতা
কেননা এইমাত্র সূর্য তাপেই
নির্দিষ্ট ক্যালরি ……
অব্যক্ত কান্নার ইভাপোরেশন ……

আইডিয়াল কষ্টিপাথরে ঘষা জীবন
ছুটবে তবু নিরঙ্কুশ
ছুট … ছুট … ছুট …
সূর্যের পরেও রয়েছে যে মহাসূর্য।

——

## ছড়া

অমিতাভ চৌধুরী

॥ এক ॥

গায়ে দিলে কুটকুট
খুলে ফেললে শীত,
বউ হলো কম্বল
জানিহ নিশ্চিৎ।

॥ দুই ॥

পুরুষের যদি কোন
মোটা লেজ থাকতো,
মেয়েদের মন তারা
লেজে বেঁধে রাখতো

# নূপুরের গুঞ্জনে

অজিত চক্রবর্তী

ঝুম ঝুম ঝুম বাজে
তালে তালে ঐ নূপুরের ঝুম।
চলেছি যে একেলা আঁধার মাঝে,
জানি না এ পথ
কোথা যে যাবো—
দেখিনাগো তবো,
আমি শুধু চলি অবিরাম॥

সাগরের ঢেউগুলো নীরবে অবিরত,
আসা যাওয়া করে শুধু তোমারই মত ;
তাই আমি ছুটে যাই কাজে।
বল বলনাগো তুমি, কতদূরে
আর কতদূরে যেতে হবে ?
কি ভাবে যাবো কোন সাজে
এনেছ যে এই রথ
কোনও অভিমানে
নূপুরের তালে
বাজে খেলা ঘরখানি
দেখা হলে তোমাকেই শুধাতাম॥

# দশভুজার পূজা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিউলীর গন্ধে আর পূজোর আয়োজন দেখে পুরানো দিনের পূজোর স্মৃতির কথা জেগে উঠছে। এ কালের ছেলেমেয়েদের কাছে তা নতুন ঠেকবে। এ পূজা তারা দেখেনি। এ পূজা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সময় বিশেষে মনে পড়ছে ছেলেবেলার কথা। সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা ভাল লাগে। সেই কথাই লিখলাম।

ওদিকে ভোরের ভিজে হাওয়াতে শিউলী ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। ছেলেবেলাতেও ঠিক এমনি করেই সনাতনী পৃথিবীর অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তনী শরৎ প্রকৃতি এসে ডাক দিয়ে যেতো। ভোরবেলা এমনি করেই আসত শিউলীর গন্ধ। পদ্ম ফুলের গন্ধও আসত মধ্যে মধ্যে। মধ্যে মধ্যে এই কারণে বলছি যে, যেবার শরৎকালে প্লাবন হত সেবার পদ্ম গাছগুলি জলে ডুবে যেত। আরও কারণ আছে যার জন্যে পদ্মদল সব বছরে সমান সমারোহে ফোটে না। কিন্তু সে থাক।

ভোরবেলা শিউলী গন্ধের সঙ্গে পুজোর সাড়া বেজে উঠত ভোরবেলার ঢাকের শব্দে। পিতৃতর্পণ মহালয়া পার্ব্বণ সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছোটবেলা থেকেই হয়েছিল। আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতৃপক্ষে পূর্ব্বপুরুষ তর্পণ কি এবং তার রীতি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আপনা আপনি। তার সঙ্গে শুনতাম চণ্ডী আরাধনার, না দুর্গাপূজার গল্প। দুর্গাপূজা বলাই ঠিক। চণ্ডী আরাধনা সে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পূজার্চ্চনা। তার সঙ্গে বাঙলাদেশের দুর্গাপূজার অনেক পার্থক্য ঘটে গিয়েছিল কালক্রমে।

কথাটা একটু খুলে বলি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে রাজ্যভ্রষ্ট নরপতি মহারাজা সুরথ এবং স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত শ্রেষ্ঠী বৈশ্যোত্তম সমাধি মহর্ষি মেধসের আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়ে সেইখানেই অবগত হয়েছিলেন চণ্ডিকার মহিমা ও পূজাপদ্ধতি এবং এই পূজার্চ্চনার ফলাফল। সেই পূজা হত বসন্তকালে; বসন্তকালেই মহারাজ সুরথ এই পূজা করেছিলেন, জগৎ প্রকৃতির রূপে, রসে, গন্ধে, গানে পরিপূর্ণ প্রসন্নতার মধ্যে। পরবর্ত্তী-কালে রামায়ণে বর্ণিত অকাল বোধনের উপাখ্যানকে অনুসরণ করে বাংলাদেশে এই পূজা প্রবর্ত্তিত হয় শরৎকালে। রাজা-মহারাজারা শক্তি-লাভের জন্য, জয়লাভের জন্য, শ্রীসম্পদ লাভের জন্য এই মহিষাসুরমর্দ্দিনীর আরাধনা করতেন ষোড়শোপচারে। বাদ্যভাণ্ডে, নৃত্যগীতে, ভোগেরাগে, হোম-বলিতে, পাঠে-কীর্ত্তনে দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর মধ্যে নিষ্পন্ন হত। সেকালে দুর্গাপূজাকে বলা হত কলির অশ্বমেধ। এ পূজা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ এবং গুরুদের গৃহে কিছু অন্যভাবে নিষ্পন্ন হত। সেখানে রাজসিকতার সমারোহ থাকত না। থাকত ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়পূর্ণ এক আশ্চর্য্য শুদ্ধ চিত্তের মহাপ্রকাশ। সেখানে দেবতার মূর্ত্তির সামনে পূজা করতে বসতেন স্বয়ং গৃহস্বামী এবং পূজা করাতেন তাঁর গুরু। আবার তামসিকতাপ্রধান পূজাও হত। হত না এমন নয়। যাঁরা ১৮৫৫।৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা জানেন, তাঁরা জানেন যে বিদ্রোহী সাঁওতালেরা জয় কামনায় দুর্গাপূজা করেছিল। আবার বর্গীদলের অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিতও দাঁইহাটে দুর্গাপূজা করেছিলেন। এ সব সত্য, ঐতিহাসিক সত্য, এবং এই সত্য যে সমাজ মনের সত্য সেই সমাজেই বিচিত্রভাবে এই পূজা, এই দেবতা এবং এই পদ্ধতি আর একটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে সত্যের মূল জ্ঞানের মধ্যে নয়, ধ্যানের মধ্যেও নয়, তার মূল হৃদয়ের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে ও ভক্তির মধ্যে। গিরিরাজনন্দিনী গৌরী-উমা-শিবপ্রিয়া শিবানী এবং চণ্ডী এখানে মিলেমিশে এক হয়ে অন্য এক চেহারা নিয়েছে। এ নিয়ে কত গান, এ নিয়ে কত কল্পনা কত কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তার আর শেষ নাই। চণ্ডী বা শক্তি দেবীর পূজকের কাছে কত শাঁখারী এসে যে বলেছে, ঠাকুর তোমার মেয়ে শাঁখা পড়েছে পুকুরঘাটে বসে। বলে দিলে, 'বাবার কাছে যাও, বলো

ফুলুজীতে টাকা আছে, আমি রেখেছি, তাই দিতে।' অথচ পূজক নিঃসন্তান কন্যাও নেই, পুত্রও নেই। শেষ পর্যন্ত পূজক পুকুরঘাটে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছে। দেবী শেষ পর্যন্ত মধ্য পুকুরে রাঙা শাঁখা পরা দুখানি হাত তুলে তাকে দেখিয়েছেন। অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র দেবীকে ঈশ্বরী পাটনীর ভাঙা নৌকায় গাঙ পার করিয়েছেন। দেবতা এখানে কন্যারূপিণী হয়ে একাকার হয়ে গেলেন বাঙালীর সংসারের মধ্যে।

এ ছাড়া আর একটা রূপ, সেটা দেবতা রূপই এবং একান্ত লৌকিক দেবতা রূপ। আরও কিছু। দেবতা রূপ ও মানুষ রূপ এক সঙ্গে; সেই রূপে তিনি আমাদের মনের মধ্যে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিলেন। আমরাই গড়েছিলাম, গড়তে চেয়েছিলাম তিলে-তিলে তিলোত্তমার মত, কিন্তু তিলোত্তমা হয়েছিলেন কিনা বলতে পারিনে।

মহালয়ার পরদিন থেকে 'ধুমুল' দিত ঢাকী দু বেলা। ভোরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা এসে ঢাক বাজিয়ে যেত দেবীস্থানগুলিতে। ধুমুল অর্থে 'ধবল', অর্থ হল "সঙ্গীত আরম্ভের প্রাক্কালীন বাজনা"; প্রারম্ভ বা সূত্রপাতও বলা যায়। দুর্গাপূজা আরম্ভ হয় ওইদিন থেকে। অনেক বাড়ীতে বা অনেক পূজায় এইদিনই বোধনঘট আসে এবং প্রতিদিন পূজা হতে থাকে। আগের কালে অনেক বাড়ীতে এইদিন থেকে নিত্য বলি হত।

শাস্ত্রমতে বোধনের যে অর্থ ই হোক এবং মন্ত্রের মধ্যে যাই বলা হোক সাধারণ মানুষেরা এর আর এক ব্যাখ্যা তৈরী করিয়ে নিয়েছিল। মনে পড়ছে কোন এক মহালয়ার ভোরবেলা পুজোবাড়ীতে ধুমুলের ঢাক শুনে জেগে উঠে সেই ভোরেই যেতে চেয়েছিলাম ঠাকুরবাড়ী। আমাদের ঠাকুরবাড়ী আমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিকের দরজা খুলেই পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিন ছিল বর্ষা এবং দুদিন আগে ঠাকুরবাড়ীতে বেরিয়েছিল প্রকাণ্ড এক গোখরো সাপ, সেই হেতু আমার পিসিমা আমাকে বাড়ীর বাইরে সেই ভোরবেলা যেতে দেন নি; তার বদলে গল্প বলেছিলেন।

বলেছিলেন এই বোধনের গল্প। যে গল্প বিচিত্রভাবে মানুষের লৌকিক জীবনে দানা বেঁধে উঠেছে।

"শাওন গেল, ভাদর এল ; জলের রং ফিরল, ঘোলা থেকে কালো হতে লাগল ; মেঘের পালকে ডাকিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ঐরাবতের মাহুত 'মাতলী'। মাতলী হলেন ইন্দ্ররাজের রথের সারথি। ঐরাবতের মাহুত, উচ্চৈঃশ্রবার সহিস। আকাশে রোদ্দুর ফুটল। শিউলী গাছে কুঁড়ি ধরল, পদ্ম, শালুক, রক্তকমল ফুটতে লাগল পুকুরে। মর্ত্যধামে রবরোল পড়ে গেল, কত কাজ, কত কাজ, কত কাজ। ঘরে কাজ, বাইরে কাজ, কাজের আর শেষ নেই ; দশভুজা মা আসবেন।

আউস ধানে হলুদ রঙ ধরল। শীষগুলি হুয়ে পড়ল চালের ভারে। সে কেটে ঘরে আনো। চাল করো, আতপ করো। ডাল কেনো, ঢেঁকিতে কোটো, গুড় কেনো, ভিয়ান হবে মিঠাই তৈরী হবে। নারকেল কোঁড়ো, নারকেল নাড়ু হবে।

খই ভাজো, মুড়ি ভাজো, গুড় মেখে মুড়কী করো, নাড়ু করো ; এমনিই মুড়ি, এমনি খই ভেজে বস্তাবন্দী করে রেখে দাও ; পূজার সময় কতজন আসবে আঁচল পাতবে ; এক একটি টুক্‌রী ( ছোট টুক্‌রী অবশ্য ) দেবে। তাদের পাঁচ-সাত দোর ঘুরলে পাঁচ-সাত টুক্‌রীতে মস্ত এক আঁচল মুড়ি হবে ; তোমারও দেওয়া হবে বহুজনকে। খড়ি মাটি কেনো ; রঙ মাটি আনো ; ঘরগুলি নিকানো হবে। সব ঝকঝক করবে, তকতক করবে। দোরের পাশে পাশে ; খড়ি নাও ; গিরিমাটি নাও, তুলি নাও ; পদ্ম আঁকো, আলপনা আঁকো।

ঘরনিকাও, দোরে জানালায় রঙ দাও, আলকাতরা দাও। পাকা ঘরে চুণের কলি ফেরাও ; ভাঙা রেখো না, ফুটো রেখো না ; বাড়ীর আশেপাশে ঘাস রেখো না, পাতার থোলা চেঁছে ছুলে নিকিয়ে তকতকে করে তোলো। তবে তো। মা আসবেন যে। বলি পাঠা কিনেছো তো ? পুকুরের মাছ আছে তো। গাইগুলি দুধ দেয় তো ? গয়লানীকে পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতের বরাত দিয়েছ তো ! ডাইল তৈরী হয়েছে ? চাল।

বাপরে বাপরে, মেয়েতে মেয়েতে দেবতাতে দেবতাতে বিশেষ আছে —এ দেবতা এ মেয়েতো যে সে মেয়ে নয় গো ! দশভুজা মেয়ে। তুমি দুহাতে দেবে সে দশ হাতে নেবে। দশ হাত ভরে দিতে না পারো, পাঁচ হাত ভরে দাও ! ঠাকরুনের দশ হাত, ঠাকরুনের এক ছেলে থায় হাতীর

মুখে, অন্ত ছেলের ছয় মুখ, বাহন একেবারে সিংহ, কর্তা যিনি তাঁর পাঁচ মুখ! নাও নাও। কাজ তোলো কাজ তোলো কাজ তোলো।

'এ মেয়ে তো মেয়ে নয় দেবতা আপনি।' তোমার কাঠের 'সেঁউতি' সোনা হবে। ভাঙা নৌকা সপ্তডিঙা মধুকর হবে। মাটির ঘর রাজার ঘর হবে। সাজো সাজো।

মর্তাধামে এই রব যখন পড়েছে, তখন কৈলাসে বসে মা জয়া বিজয়া সখীর সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলছিলেন কড়ি নিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল বড় মেয়ে লক্ষ্মী মন্দাকিনীর জলে সোনা গুলছেন আর ছুড়ে ছুড়ে রৌদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্র যেন সোনা সোনা হয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মর্তাধামের কথা। তিনি বলেন, বলো তো জয়া এটা কোন্ মাস? আমার মন কেন এমন করে, আমার আসন কেন নড়ে মুকুট কেন টলে? জয়া বলে, মা এটা তো ভাদ্র মাস শেষ হচ্ছে, আশ্বিন আসছে।

মা বলেন, তবে তো আমার মর্তে যাবার সময় হল? হল না? জয়া বলে, হল বইকি! মা বলেন, কোন তিথি আজ? জয়া বলে, এই কৃষ্ণপক্ষ পড়ল মা, পিতৃপক্ষের প্রতিপদ। মা বলেন, তুই যা তাহলে মর্তাধামে দেখে আয়। মর্তে লোকেরা আমার জন্তে কি আয়োজন করছে।

জয়া আসেন মর্তাধামে। দেখেন মাঠভরা ধান ঢেউ খেলছে, পুকুর নদী ভরা জল থৈ থৈ করছে; কল কল করে সাগরে যাচ্ছে। আউস ধানে পাক ধরছে। ঘরে ঘরে কাজ পড়েছে, অনেক কাজ, অনেক কাজ অনেক কাজ। কিসের এত কাজ গো? ওগো ও গেরস্ত! এত কাজ কিসের? কার জন্তে?

কার জন্তে? কিসের জন্তে? ও মা তুমি কি আকাশ থেকে পড়লে মেয়ে? কাজ আমাদের মায়ের জন্তে?

জয়া এই পরিপূর্ণ বাংলার সংসারে মেতে গেলেন, জমে গেলেন। ফিরলেন না। ওদিকে মা ভাবছেন। কই? জয়া গেল কিন্তু ফিরল না তো? পনের দিন পর মহালয়া। মা পাঠালেন বিজয়াকে। তুই যা বিজয়া দেখে আয়। তখন বোধনের ঘট আসছে, ঢাক বাজছে, কাঁসি বাজছে। ঢেঁকিতে পার পড়ছে। ভিয়েনের বাস উঠছে। রোদের

ছটায় খড়ি গিরি রাঙা মাটি নিকানো ঘরগুলি ঝলমল করছে। চণ্ডীমণ্ডপে বলি হচ্ছে। রান্নাশালে ভোগ রান্না হচ্ছে; বিজয়া সেই সব দেখে থেকে গেলেন। জয়া খাচ্ছিলেন মিঠাই নাড়ু, বিজয়া মজলেন বোধনের দিন থেকে নিত্য বলির মাছ, পাঁঠার স্বাদে। ভুলেই গেলেন যাওয়ার কথা।

তারা ভুললেও কিন্তু মর্ত্যধামে লোকেরা ভোলেনি। তারা দুবেলা ঢাক বাজায়, কাঁসি বাজায়, শাঁখ বাজায়, ঘণ্টা বাজায়, ধূপ জ্বালে, প্রদীপ জ্বালে, ফুল তুলে মালা গাঁথে; চন্দন ঘসে মাথায়, ঘটের গলায় সিন্দুরের বিন্দু দেয় আর বলে—

এস এস মা এস, এস এস আমাদের ঘর আলো করা বুক আলো করা মন আলো করা দেবতা এস, ঠাকরুণ এস মা এস; এস আমাদের মেয়ে এস। এস মা দশ হাত বাড়িয়ে আমাদের কল্যাণ নিয়ে এস। আমরা তোমার দশ হাত ভরা আশীর্ব্বাদ কল্যাণ নেব, আর তার বদলে ওই দু'খানি চরণে ঢেলে দেব আমাদের ভক্তি আর চোখের জল।

এ এক বিচিত্র পূজা সংস্কার ও পদ্ধতি বাঙালী জীবন থেকে গড়ে উঠে সত্য পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে মিথ্যাচার ছিল না, মিথ্যা ছিল না। আশ্চর্যভাবে সেই পুরানো কথাই আজ মনে পড়ছে।

---


...তৃতীয় ও সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো ভারতের অন্তরাত্মার ধর্ম যা তাকে ধরে তারই সহায়ে সম্পূর্ণ নূতনভাবে আধুনিক সমাধানের চেষ্টা করা।

—শ্রীঅরবিন্দ

BIREN BOSE & CO.

SANITARY ENGINEERS

P-24, Gariahata Road,

Calcutta-29

Phone : 46-1481

Branch : Assansol Phone : 2674

# দেশে. কত দূরে—কালে, কত আগে

নলিনীকান্ত গুপ্ত

আমরা আকাশে যে জ্যোতিষ্ক বা আলোর মণ্ডল সব দেখি, সাধারণতঃ মনে হয় তারা রয়েছে একই সমতলে, আমাদের কাছ থেকে সকলেই সমান দূরে। গ্রহ হোক, উপগ্রহ হোক বা নক্ষত্র হোক কোন পার্থক্য তাদের মধ্যে দেখা যায় না—শিশুর দৃষ্টিতে যেমন। রবি, সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—সব ঘুরে চলেছে যেন এক ঢালা ফরাসের উপর দিয়ে।

কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়। বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের ফলে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের ও মনের ভুল সংস্কার করে চলে। সে দেখতে পায়, চাঁদ হলো সকলের চেয়ে কাছে, চাঁদের আলো আমাদের পৌঁছে প্রায় দেড় সেকেণ্ডে। তুলনায় সূর্য বহু দূরে, সূর্যের আলোর পক্ষে দরকার আট মিনিট। আলোর বেগ গণনা করে আবিষ্কার করা হয়েছে, তা হলো সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার (প্রায় দুই লক্ষ মাইল)। আর চাঁদের চেয়ে বেশ দূরে রয়েছে পৃথিবীর সমগোত্র আর আর সব গ্রহ। তার কয়েকটি আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছে সূর্যের তুলনায়। বুধ গ্রহ হল এখান থেকে দু'তিন মিনিটের রাস্তা আলোর পক্ষে: শুক্র হলো পাঁচ ছয় মিনিটের রাস্তা। অন্য গ্রহগুলি আরও বেশ দূরে। শনি আগে ছিল সবচেয়ে দূরে—তাই তার নাম হয়েছিল শনৈশ্চর অর্থাৎ ধীরে ধীরে চলে যে অথবা মন্দী, মন্দ গতিতে যে চলে, তার হল ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। পরে অবশ্য আবিষ্কার হয়েছে নেপচুন, ইউরেনাস, প্লুটো—এদের সকলের কয়েক ঘণ্টার পাল্লা। আমাদের এই সূর্য আর তার গ্রহ এবং উপগ্রহ হলো একটা গোটা রাজ্য। একে বলা যায় রবিক্ষেত্র (solar system)। এর প্রসার বা আয়তন হবে বড় জোর ঘণ্টা পেরিয়ে দিনের পাল্লা।

কিন্তু এরকম রবিক্ষেত্র রয়েছে আরো অনেক অসংখ্য অগণিত। ফলতঃ আমরা যাদের বলি নক্ষত্র, তাদের প্রত্যেকটিই এক একটি সূর্য্য। এবং এমন নক্ষত্র আছে যা আমাদের সূর্য্যের চেয়ে এত বড় যে তার মধ্যে বহু সূর্য্য ডুবে তলিয়েযেতে পারে। স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যে স্থান পাবে আট হাজার সূর্য—তার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের বিশগুণ। আর জ্যেষ্ঠা ( Antares ) নক্ষত্র ধরে রাখতে পারে কয়েক কোটী সূর্য্য, তার ব্যাস সূর্য্যের ব্যাসের পাঁচশ গুণ। পৃথিবীর ব্যাস আমরা জানি সাড়ে সাত হাজার মাইল, সূর্য্যের ব্যাস এর ১০৯ গুণ—অর্থাৎ সূর্য্যের মধ্যে ডুবে যায় ১৩ লক্ষ পৃথিবী। এখন তাদের দূরত্ব? সব চেয়ে কাছে যে সব নক্ষত্র তাদের দূরত্ব মাপতে হবে মিনিট, ঘণ্টা বা মাস দিয়ে নয়, বছর দিয়ে অর্থাৎ এক বছরে আলো যতদূর যায় তাই হল মাপকাঠি। এই হিসাবে সর্বাপেক্ষা নিকটতম নক্ষত্র রয়েছে তিন-চার বৎসরের পথ পারে। তার কিছু দূরে, কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী। তার কাছে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে তারাটি—সকল তারকার মধ্যে উজ্জ্বলতম একটি তারকা, উজ্জ্বল গ্রহের মতই দেখতে, নাম লুব্ধক ( Sirius )—তার পথ হ'ল ন বৎসরের। তারপর কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ—এর প্রয়োজন হয় প্রায় বছর চব্বিশেক। আর ধ্রুব নক্ষত্র, তার পাল্লা পঞ্চাশ বৎসরের। উপরে যে স্বাতী ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কথা বলেছি—স্বাতীর হ'ল চল্লিশ বৎসরের পাল্লা কিন্তু জ্যেষ্ঠার সাড়ে তিনশ বৎসরেরও বেশি, আরও দূরে হলেন অগস্ত্য ঋষি ( Canopus ) দক্ষিণ আকাশ প্রান্তে সবচেয়ে বৃহত্তম উজ্জ্বলতম যে জ্যোতিষ্ক—তাঁর প্রয়োজন সাড়ে ছশ বৎসর। দূরের চক্ষুগ্রাহ্য তারকা এ রকমে তবে ছশ সাতশ বৎসরের পাল্লা। তারপর এসব ছাড়িয়ে দেখেছ ছায়াপথ? এক সময়ে মনে করা হত ওসব হল ধোঁয়ার পুঞ্জ, মেঘের মত, বাষ্পীয় কিছু, নিরীক্ষণ করে, পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেল আসলে ওরা তারকাগোষ্ঠি, রয়েছে আরও বহুদূরে—এত দূরে বলে, দেখায় যেন সব একসঙ্গে মিশে গিয়েছে, একাকার হয়ে গেয়েছে ধূম্রাকার। কিন্তু কত দূরে? এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের পাল্লা হবে আড়াই হাজার বৎসর অর্থাৎ আলোকের লেগেছে আড়াই হাজার বৎসর এখানে পৌঁছতে—সূর্য্য থেকে পৌঁছতে যে আলোকের লাগে আট মিনিট মাত্র, যে আলোকের গতিবেগ বলেছি সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। অর্থাৎ অন্য কথায় এই সব আলোক-বিন্দু আজ যে আমরা দেখছি সেটা হল

বুদ্ধের সময়কার এবং আজ তারা এখনও আছে কিনা তা জানা যাবে আরো আড়াই হাজার বৎসর পরে। এই আড়াই হাজার বৎসর তাহলে আমাদের মণ্ডলটির ব্যাসার্ধ—আমাদের দুপাশে হাত বাড়ালে অর্থাৎ দৃষ্টি ফেরালে পারাপার হবে পাঁচ হাজার বৎসর। এই পাঁচ হাজার বছর পরিমাণ যে মণ্ডলটি নিয়ে আমরা রয়েছি তার নাম দেওয়া হয় galaxy, নক্ষত্রমণ্ডলী। কিন্তু এও হলো একটা মণ্ডলীমাত্র। এর বাইরে, এর থেকে দূরে ক্রমেই বেশি দূরে দূরে রয়েছে আরও অগণিত মণ্ডলী অর্থাৎ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এই রকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে দূর হতে দূরান্তরে—কিন্তু এও তবু শেষ নয়। মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যখন বেড়ে গেল অসম্ভব রকমে, যান্ত্রিক উদ্ভাবনে এবং গাণিতিক কৌশলে, তখন ক্রমে লক্ষ্য করা গেল, আমাদের দৃষ্টিগোচর কয়েকটি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ পিছনে রয়েছে কতগুলি পৃথক বিশেষ রকমের নক্ষত্রপুঞ্জ অথবা বাষ্প বা ধূলিপুঞ্জ। এদের বিশেষত্ব ধরা গেল এদের দূরত্ব দিয়ে—হাজার, দশ হাজার বছরের দূরত্ব কিছু নয়, এদের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ বছরেরও উপরে। এদের আলো আমাদের কাছে পৌঁছতে লেগেছে যে কত আলোক-বৎসর তার ইয়ত্তা নাই। এ রহস্যের অর্থ, ব্যঞ্জনা অনেকখানি। কিন্তু আমরা এতক্ষণ বলেছি দৃষ্ট আলোকের কথা। কিন্তু এদেরও পিছনে এদের থেকেও বহুদূরে রয়েছে উৎস—চক্ষুগ্রাহ্য আলো নয়, অদৃশ্য আলোকের—রেডিও সংকেতের তরঙ্গ। এবং এদের দূরত্ব হ'ল কোটি কোটি কোটি অর্বুদ, খর্ব নিখর্বের পাল্লা। কারণ এ-আলো এ দৃশ্য আলো হল সেই দূরতম অতীতের—আদিমতম সৃষ্টির একখণ্ড আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে, কি গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেছে তারা, তাদের ধর্ম্মের কর্ম্মের গঠনের সম্বন্ধে? কারণ আমরা এমন একটা অতীতে পৌঁছে গিয়েছি যেখানে জড় আর জড়মুষ্টি নেই, হয়ে গিয়েছে জড়চূর্ণ—মূল ভূত পর্য্যন্ত বিচূর্ণ হয়ে পর্য্যবসিত হয়েছে তাদের আদি বিদ্যুৎ-চৌম্বক কণা করঙ্গে।

এখন আরো কিছু আগে চলতে হবে। এই যে নীহারিকা-বাহিনী বা ব্রহ্মাণ্ড-শ্রেণী প্রসারিত হয়ে গিয়েছে আকাশের পর আকাশ বেয়ে অনন্ত ধারায়, যাদের স্থিতিকালের পরিমাণ কল্পনা করা যায় না, তাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য—বিচিত্র বৈশিষ্ট্য—বিশেষভাবে ধরা দিয়েছে। এইসব জগৎ স্থির নয়, তারা গতিশীল। একটা সুগঠিত ছকের মত তারা যে অচল অটল হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে আদিকাল হতে আজ অবধি তা আদৌ নয়। সমগ্র সৃষ্টিখানি, সৃষ্টির অন্তর্গত সকল বস্তুই, স্থির কেউ নয়, সকলই গতিমান তবে গতি অর্থ আবার এমন নয় যে সকলই ছুটে চলেছে এক দিকে একভাবে সমান বেগে। তারা ছুটে চলেছে বটে কিন্তু প্রথমতঃ ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ যত এগিয়ে চলেছে প্রত্যেক অংশ বা প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অংশ বা প্রত্যেক অংগ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে সরে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শুধু তাই নয়, যত এগিয়ে চলেছে ততই সকল বস্তুর বেগ বেড়ে চলেছে। যত-দূরে এগিয়ে গিয়েছে, গতিবেগ তত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এমন অবস্থা হয়েছে, দূরতম অংশের গতি এমন হয়েছে যে প্রায় তা পেয়েছে আলোর গতি। আমরা যে দূরতম অদৃশ্য আলোর কথা বললাম তারাই প্রায় উঠে গিয়েছে গতির এই পর্য্যায়ে। এই দূরতম অংশ বর্তমানে আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে গণনার মধ্যে এসে গিয়েছে, তাদের গতি যদি আলোর গতি ছাড়িয়ে যায় অর্থাৎ যদি আরও আমরা এগিয়ে চলি—আরও দূরের বা আরও অতীতের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছি, তাহলে আমরা একটা গভীর অতলে যেন তলিয়ে যাব, আর কিছুর হদিশ পাব না; কারণ আলোর গতির বাইরে যদি এসে পড়ি তবে সেখানে জানবার উপায় থাকবে না। লবণের পুতুলের মত সত্যসত্যই আমাদের সত্তা অনন্তের প্রসারে গলে হারিয়ে যাবে।

আলোই হল সমস্ত মানুষী জ্ঞানের মাপকাঠি—জড় :যত সূক্ষ্মতম, ক্ষুদ্রতম হোক তা আবিষ্কার করে ধরে আলো, ব্যক্ত আলো এবং অদৃশ্য আলো। জড়ের নিবিড়তম স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম তা রশ্মি-তরঙ্গের মাপে আপনাকে মেপে দেয়। আলোর বেগের বেশি যার বেগ তাকে আমরা ধরতে পারি না; আমাদের আলো তার পিছনে গিয়ে ক্রমে পিছনেই পড়ে যায়, তার নাগাল পায় না।

সুতরাং আলো-তরঙ্গের বাইরে উত্তীর্ণ যখন আমরা, তখন মনে হয় আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি উপনিষদ-উক্ত প্রসারের দুয়ারে—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি…। এই রকমে জড়ের প্রসার দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে যেখানে এবং যখন লাভ করেছে আলোর বেগ, তখনই হঠাৎ সে পড়ে যাবে যেন একটা শূন্যের মধ্যে। এ তুলনা কতকটা হবে

শব্দের সীমানা (Sound-barrier) যে মুহূর্তে পার হয়ে যায় বিমান-যাত্রীরা, তখনকার অনুভবের সঙ্গে। অনেক পাইলটরা বলেছেন এ কথা।

এখানে কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আরও একটা রহস্যের কথা বলছেন, তাঁরা পিছু-পা হবার নন। তাঁরা বলছেন সৃষ্টির এই শেষ অর্থাৎ আদি প্রান্তে, এবং তারও পারে জড়ের যে রূপ তা হল বিপরীত-জড়। আমাদের স্বাভাবিক সাধারণ সৃষ্টি পরিণামে গঠিত কতকগুলি সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম কণা দিয়ে—কণা অর্থ একটুকরো বৈদ্যুত-মাত্রার তরঙ্গ। আজকাল আমরা অনেকেই একথা জানতে শিখেছি: মূল নিত্যনৈমিত্তিক কণা হল তিনটি—(১) ইলেকট্রন যা ভারহীন ও বিয়োগ-বিদ্যুৎ (২) প্রোটন—তা হল ভারযুক্ত সংযোগ-বিদ্যুৎ, আর (৩) নিউট্রন—ভারযুক্ত কিন্তু বিদ্যুৎমাত্রহীন। এখন দেখা গিয়েছে এদেরই সঙ্গে, জড়-আয়তনে এখানে পাওয়া গিয়েছে এদের ঠিক বিপরীতধর্মী কণা। যেমন প্রথম, বিপরীত-ইলেকট্রন যার হবে সংযোগ-বিদ্যুৎ, এর নাম হয়েছে পোজিট্রন। দ্বিতীয়, বিপরীত-প্রোটন যার হবে বিয়োগ-বিদ্যুৎ। তারপর, বিপরীত-নিউট্রন—নিউট্রনের কোন বৈদ্যুৎমাত্রা নেই, তবে তার বিপরীত কি হবে? এখানে তা হ'লে বলতে হয় আদি-কণাদের আর একটি গুণের বা ধর্ম্মের রহস্য। তা হ'ল তড়িতমাত্রা ছাড়া, তড়িতমাত্রার ভাব অভাব ছাড়া, ঘূর্ণি-মাত্রা অর্থাৎ তারা নিজের চারদিকে ঘোরে বা পাক দিয়ে চলে, লাট্টুর মত। এ ঘূর্ণি থেকেই আসে কণাদের চৌম্বক-শক্তি। নিউট্রনের তড়িৎমাত্রা নেই, আছে ঘূর্ণি বা চৌম্বক মাত্রা। তারা দেয় অর্দ্ধেক মাত্রার ঘূর্ণি। তবে ঘূর্ণি হতে পারে আবার ডান দিক দিয়ে বা বাঁ দিক দিয়ে (দক্ষিণাবর্ত্ত কি বামাবর্ত্ত)। বিপরীত নিউট্রনের হল বিপরীত ঘূর্ণি।

যা হোক সাধারণ বা স্বাভাবিক শ্রেণীর কণাগুলি হ'ল যেন জগৎ-ইমারতের ইঁট পাথর। তাদের যথাযথ সমাবেশে গঠিত হয়েছে এই জড়-জগৎ। বিপরীত কণাগুলি আছে বটে কিন্তু অতি সুদুর্লভ আর তারা স্থায়ী নয়, ক্ষণিকের প্রকাশ। এখন অনেক বৈজ্ঞানিকেরা বলতে সুরু করেছেন, আলো তরঙ্গের (দৃশ্য বা অদৃশ্য) বাহিরে গিয়ে সৃষ্টি যেখানে ঘূর্ণিত বাষ্পাকার হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে বা সেখানেই হ'ল এই কেবল বিপরীত-কণা দিয়ে গঠিত জগৎ, আমাদের জগতের উল্টা বা পাল্টা জগৎ



P 29597

একটা। আরও বলা হয়েছে, আলোর জগৎ অর্থাৎ বৈদ্যুত-চৌম্বক-তরঙ্গমালা-সমষ্টি ছুটে চলতে চলতে যখন তার বিপরীত তরঙ্গ-সমষ্টির জগৎকে গিয়ে আঘাত করে, তার উপর পড়ে একটা বিকট ধাক্কা দিয়ে, তখন ঘটে মহা বিপর্যয়, মহাপ্রলয়। অর্থাৎ সহজে ও বিপরীতের পরস্পরের সংঘাতে সূত্রপাত হয় নবসৃষ্টির। এই রকমেই আমরা কল্পনা করতে পারি, জগতের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং নব নব জগৎও সৃষ্টি হয় এই রকমে। আমাদের জগৎ ক্রমে প্রসারিত হয়ে বিকীর্ণ হয়ে, আমাদের পরিচিত জড়কণা যখন তার আপন বেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তার আদিতম সূক্ষ্ম কণাতরঙ্গে পর্যবসিত হয়েছে (এর নাম দেওয়া হয়েছে fission—বিয়োজন) এবং বিষম বেগে পড়েছে গিয়ে তাদের বিপরীত গুণাবলির উপর, বিপরীত-জড়কণা-তরঙ্গাবলির মধ্যে, তখন সৃষ্টি আবার সংহত ঘনীভূত হতে সুরু করেছে (এর নাম দেওয়া হয়েছে fusion—সংযোজন)। বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন পরমাণুর পরম সূক্ষ্ম তরঙ্গ-উপাদান আবার তাদের গতি ও তাপ সংযত করে এনেছে, ক্রমে আলোর স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে, নীহারিকাপুঞ্জ গড়ে দিয়েছে, আবার তারকামণ্ডলী সূর্য্য দেখা দিয়েছে। এরকম একটা প্রলয় ও নব সৃষ্টির পারম্পর্য্য জগৎ-রহস্যের মূলধর্ম্ম।

[সম্প্রতি মহাকাশ জয়ের মানবীয় প্রয়াস সকলকে বিস্মিত করেছে এই বিস্ময়ের সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কের মহাবিস্ময় তুলে ধরার জন্যে এ নিবন্ধটি প্রকাশ করা হলো 'বর্তিকার' সৌজন্যে।—সম্পাদক]

---

*Space Donated By :—*

**The Antibiotic Stores Private Limited**

**PHARMACEUTICAL DISTRIBUTORS**

**55 Biplabi Rashbihari Basu Road**

**Calcutta-1**

# কৃতজ্ঞ হওয়া

পশুপতি ভট্টাচার্য

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এ গান কতই আমরা গেয়েছি—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে"

এখনও এ গান প্রায়ই শুনে থাকি রেডিও মারফত।

কিন্তু কেবল মুখে বলা বা গানে গাওয়া নয়; এর সত্যকে বাস্তবরূপে হৃদয়ঙ্গম করা, সত্যসত্যই হৃদয়ে সেই সার্থকতা অনুভব করা—তারই নাম কৃতজ্ঞতা। যখন তা অনুভব করব তখন কেবল মুখে বলবনা, তখন আমাদের কাজের ভিতর দিয়েও তা প্রকাশ পাবে।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে কৃতজ্ঞতা হলো স্বাভাবিক জীবধর্ম। উপকার পেলে বা কিছু সাহায্য পেলে ছোটো বড়ো সকল জীবই দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কুকুর বেড়াল যে কেমন প্রভুভক্ত হয় সে কথা সকলেই জানে, আপন সহজাত প্রবৃত্তি হতেই তারা পোষ মানে। এমন কি অতি হিংস্র বাঘ সিংহ এবং সাপেও পোষ মানে। এই পোষ মানা কৃতজ্ঞতারই নামান্তর।

আমরাও কৃতজ্ঞ হতে জানতাম যখন সহজ ও সরল ছিলাম। কিন্তু এখন বেশি বুদ্ধি পেয়েও চতুর হয়ে কৃতজ্ঞ হতে ভুলে গেছি। শিখেছি অকৃতজ্ঞ হতে। সেটাই এখন স্বাভাবিক, তাই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, অমুক আমার নিন্দা করছে কেন, আমি তো তার কোনো উপকার করিনি।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা যে কতখানি দামী জিনিষ, তাতে যে এমনিতেই মনকে কতখানি উদার ও উন্নত ক'রে দেয় সে কথা আমরা ভেবে দেখি না। প্রেম আর কৃতজ্ঞতা একই থাকের জিনিস। প্রেমে যেমন তোমাকে সুনমা ক'রে দেবে, কৃতজ্ঞতাও তাই ওর থেকে তোমাকে প্রেমে টেনে নিয়ে যাবে, তার

থেকে নিশ্চিত একটা সার্থকতায় নিয়ে যাবে। আমাদের মা তাই বলেছেন —Gratitude is the surest way to victory. সর্বদা কৃতজ্ঞ হতে চেষ্টা করো, তোমার জয়লাভ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চোখের সামনে এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। ছেলেবেলা থেকে বিলাতে মানুষ, নিজের দেশ চিনতেন না। বড়ো হয়ে যখন ভারতে এসে পা দিলেন, সেই মুহূর্তেই জানলেন এই আমার মাতৃভূমি, আমার মা, এঁরই কোলে আমি জন্মেছি, এঁকে মা বলতেই আমার জীবন সার্থক। বাস, তখন থেকেই তিনি মাকে চিনে কৃতজ্ঞ হয়ে এমনই আত্ম নিবেদন শুরু করলেন যে তার ফলে তাঁকে সর্বোচ্চে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়ে তুললে। তার থেকে তিনি ভগবানকে চিনলেন, ভগবানকে পেলেন আর জগৎকে এক দিব্যজীবনের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

আর মায়ের জীবনই কি কম দৃষ্টান্ত। ফরাসী দেশে জন্মেও তিনি ভারতে এসে যেমনি পা দিলেন অমনি বললেন এই আমার আসল মাতৃভূমি। বাস্, তারপর থেকে তিনি আর এক পাও কোথাও নড়লেন না। এখানেই তিনি বিরাট আশ্রম বানালেন, বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র বানালেন, আবার এখন অতিবিরাট এক অরোভিল নগরীর পত্তন করছেন। শুধু কি তাই, ভগবানের অতিমানস শক্তিকে তিনি এখানে নামিয়ে এনেছেন, যাকে দিয়ে জগতে অসাধারণ কিছু করাবেন।

আর আমরা কি করছি? আমরা আসুরিক শক্তিধর বিদেশী নেতার কাছ থেকে নতুন শ্লোগান নকল করতে শিখেছি—"মেরেধরে কেড়েকুড়ে নাও। শক্তি থাকে কেবল বন্দুকে ও বোমাতে, তারই জোরে সব কিছু মিলবে। ছাত্ররা যদি বাঁচতে চাও, এই পন্থা অবলম্বন করো।" আগেকার মন্ত্র ছিল "বন্দে মাতরম্" আর এখনকার মন্ত্র "জিন্দাবাদ" ও "মুর্দাবাদ"। কেড়েকুড়ে অনেক কিছুই মিলতে পারে ধনদৌলত জমিজমা ইত্যাদি, কিন্তু যা মানুষের আসল কাম্য বস্তু, সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, তা কি কেড়ে নেওয়া যায়? এ কথা আমরা ভেবে দেখি না। নতুন শ্লোগান পেয়েছি, চোখ বুজে গলা ফাটিয়ে তাই আওড়াতে থাকি।

তার কারণ আমরা নিজেদের সব কিছুই ভুলে গেছি। নিজেদের প্রকৃতিকে, নিজেদের অতীতকে ও ঐতিহ্যকে, নিজেদের পরিচয়কেই ভুলে

গেছি। দিব্যালোকস্নাত যে মহান উপদ্বীপের অধিবাসী আমরা যেখান থেকে করুণাঘন বুদ্ধের অহিংসার অমৃতবাণী সারা জগতের মানুষকে চমৎকৃত করেছে, সেখানে উপর্যুপরি মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ এসে একই মহামন্ত্র শুনিয়ে গেছেন যা ভোগের নয় ত্যাগের, যেখানকার আকাশে বাতাসে কবির তুলসীদাস মীরাবাঈ এর ভজন, বাউলদের প্রেমগান, শ্রীচৈতন্যের হরিনাম কীর্তন রামপ্রসাদের রামপ্রসাদী, রবীন্দ্র সঙ্গীতের আত্মনিবেদন নিত্যই ভেসে বেড়াচ্ছে, সেখানকার আদর্শ আমরা বিস্মৃত হয়ে অন্যরূপ আদর্শ বরণ করেছি যা আসুরিক। অথচ জগতের অধিকাংশ সভ্য দেশই এখন এখানকার আদর্শের দিকে ঝুঁকেছে। আমরা কিন্তু তা গ্রাহ্যই করি না। কিছুদিন আগেই আমাদের কত ভাই আমাদের স্বাধীনতার জন্যে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু -এখনকার কথা অন্য রকম, এখন আমরা হাসতে হাসতে আপন ভাইদেরই বুকে ছুরি বসাই, মাথায় ডাণ্ডা পিটিয়ে খুন করি। কৃতজ্ঞ আমরা কার কাছে হবো? অন্নদাতা বাপ মায়েরা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, দেশমাতা একটা কবি কল্পনা মাত্র, আর ভগবান মোটে মানবই না, ভূত মানা যেমন মনের দুর্বলতা ভগবান মানাও তাই। নিজের জোরে দাঁড়িয়ে আছি, নিজের জোরে নিজের জন্যে লড়ে যাবো। এই এখন মনোভাব। কারো পরোয়া করি না। যদিই বা ভগবান মানি, তা তিনিও থাকুন আর আমরাও আছি। তাঁর যা খুশি তিনি করবেন, আমরাও যা খুশি তাই করব। আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অধিকার কারো নেই।

কিন্তু ভগবান হাসছেন। এতে তার কাজের কোনো ইতর বিশেষ হচ্ছে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে এগুলো temporary check, এতে বিবর্তন লীলার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং সুবিধাই হয়, নতুন দিকে মোড় ফেরাতে। দুনিয়ার মালিক তিনি আমাদের এই সব সত্ত্বেও রক্ষা করে যাচ্ছেন, আমরা যে কতখানি নির্বোধ কতখানি অসহায় তা জানতেও দিচ্ছে না। মা তাই খোলাখুলি বলেছেন—It is at each instant of our life that the Lord saves us so wonderfully that in our blindness we do not even know it." এ অতি সত্য কথা, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে এখন আশ্চর্যরূপে ও এত সহজে জগৎপ্রভু আমাদের

রক্ষা করে যাচ্ছেন যে অন্ধ আমরা তা আদৌ জানতেই পারি না। তিনি আমাদের শত দোষ সহস্র অন্যায়কে উপেক্ষা করে সমানে আমাদের সকল রকমের বিপদ আপদ থেকে যদি এই ভাবে বাঁচিয়ে না রাখতেন তাহলে কি আজ আমরা এই ভাবে তড়পাতে পারতাম, আমাদের ক্ষুদ্র গোস্পদের জলে তুফান তুলতে পারতাম ?

কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমা করেন, দয়া করেন, করুণা করেন, রক্ষা করেন। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলে পদে পদেই আমরা তার পরিচয় পেয়ে থাকি। এমন কে আছে যে একাধিক মহাবিপদ থেকে বেঁচে যায়নি, সমূহ সর্বনাশ থেকে রক্ষা পায়নি ? অথচ কয়জন তা মানে ? প্রায়ই শুনতে পাই তারা বলে, দৈবাৎ বেঁচে গেছি। সবই কি দৈবাৎ হয় ?

সম্প্রতি সেদিনকার একটি ঘটনার কথা বলি। ফিরছিলাম ট্রামে। মোড়ে এসে নামব। ট্রাম দাঁড়িয়েছে মোড়ে। আমি নামতে যাচ্ছি, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে একটিমাত্র পা নামিয়েছি, এমন সময় সবুজ আলো পেয়ে ট্রামগাড়ি হ্যাচ্‌কা মেরে ছেড়ে দিল। নিচে ছিল কাদা, পিছলে গিয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। একটা পা ঢুকে গেল চাকার সামনে লাইনের উপর। বেশ বুঝতে পারলাম, এখনই এক মুহূর্ত পরে পাখানি নিষ্পেষিত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। মা—বলতে না বলতেই হঠাৎ আবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম, আরো খানিক ছিটকে গেলাম, পা লাইন থেকে বেরিয়ে এলো, ট্রামগাড়ি আমার পিঠে আঘাত ক'রে বেরিয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, আরো এক ব্যক্তি আমার পরে নামতে গিয়ে আমার উপর হুড়মুড়িয়ে পড়েছে, তারই ধাক্কা খেয়েছি এবং তাতেই বেঁচে গেছি। উঠে দাঁড়াতে পারলাম। হাতে পায়ে স্থানে স্থানে ছড়ে গেছে, কাদায় কাপড় কাদা মাখামাখি হয়েছে, কিন্তু আর কোথাও কিছু হয়নি। এমন কি চশমাও ভাঙেনি, ছাতাও ভাঙেনি, কোন কিছু ক্ষতি হয়নি।

একেও কি দৈবৎ বলব ? এতটা কৃতঘ্ন হতে পারবনা। যখন স্পষ্টই টের পেলাম যে কোনো অদৃশ্য শক্তি আমাকে এক সমূহ সর্বনাশ বা অঙ্গহানি থেকে রক্ষা করলে। তাকে ভগবান বলি, দয়াল বলি, প্রভু বলি, মা বলি, অথবা যাই কেন বলি। এমন স্থলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতেই হয়, না হয়ে পারা যায়না।

( শেষাংশ ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন।)

# সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন

দেবদাস ভট্টাচার্য

শিরোনামটি বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও লেখক মহলে অনেকের কাছে সম্প্রতি শিরোপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক গোষ্ঠী এবং বিদগ্ধ সমালোচকগণ এ বিষয়ে খ্যাত ও অখ্যাত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট যুক্তি-তথ্য পূর্ণ সরস-নিরস চুটকি রসিকতা থেকে নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সুতরাং সেই বহু বিতর্কিত ও আলোচিত বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে যে নিতান্ত পরিহাস যোগ্য বাতুলতা মাত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সব আলোচনা আমার কাছে 'সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে' গোছের বলে মনে হয়েছে।

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে বড়ই জটিল। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে—অশ্লীল হচ্ছে সেই বাক্য যা—"ব্রীড়া জুগুপ্সা মঙ্গলাতঙ্কদায়ী।" অর্থাৎ যা শুনলে আমাদের মনে লজ্জা, ঘৃণা, অমঙ্গল ও আতঙ্কের উদয় হয় তাকেই বলা হয় অশ্লীল। যে বই পড়তে পড়তে লজ্জায় দেহ কুঞ্চিত হয়, সে শিহরণ নিশ্চয় রসের আস্বাদে নয়। সেখানে রসের অলৌকিকত্বের পরিবর্তে জেগে ওঠে স্থূল লৌকিক বোধ। লজ্জা, ঘৃণা, অমঙ্গল ও আতঙ্ক এক্ষেত্রে রসের অপঘাতই ঘটায়।

বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছুদিন ধরে এক শ্রেণীর লেখক "শিল্পীর স্বাধীনতা এবং সমাজ ও জীবনের নিখুঁত-বাস্তব রূপ চিত্রায়ণে"র অজুহাতে এবং সাহিত্যের শ্রেয়োবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার উত্তেজনায় তাঁদের গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে বিকৃত যৌন সম্পর্কের এবং নরনারীর দেহ ভোগ লালসার মহোৎসবে যেন আদা-নুন খেয়ে লেগে গেছেন। আমার মতে এই শ্রেণীর লেখক ও তাঁদের রচনার প্রকাশকগণ

এক বিশেষ ধরণের ব্যবসায়ী। তাঁরা সাহিত্য ছাড়া অন্য যে কোন ব্যবসায়ও হয়তো করতে পারতেন তবে এতে মূলধন খুব সামান্য লাগে —বাড়ীভাড়া নিয়ে 'শোরুম' সাজানোর প্রশ্ন থাকে না—রাতারাতি জনপ্রিয় হওয়া যায় এবং সর্বোপরি যত বিতর্ক উঠবে পাঠকের সংখ্যা আর বইএর দুর্মূল্য কপিগুলোর চোরা কারবারও ততই ফেঁপে উঠবে, তাই হয়তো অনেক ভেবে-চিন্তে এই ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন।

এই শ্রেণীর বিতর্কিত কয়েকটি বই-এর লেখক ও প্রকাশকের নামে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে এবং এই রকম একখানি বই-এর লেখক ও প্রকাশক আদালতের রায়ে দণ্ডিতও হয়েছেন শুনেছি। আইন-আদালতের মধ্যে যাচ্ছি না কেননা তার জন্য আইন এবং তার বিশারদেরা আছেন। আমার আলোচনা সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং তার উদ্দেশ্য নিয়ে।

রস সৃষ্টিই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই রসের সঙ্গে সত্য, মঙ্গলময়তা এবং সৌন্দর্য জড়িত থাকা চাই। বস্তু জগৎ এবং মানব-হৃদয় তাদের বহু উপকরণ ভাবনা নিয়ে সাহিত্যিকের মনে প্রতিফলিত হয় এবং একটি স্বতন্ত্র জগতের সৃষ্টি করে। সাহিত্যিক সে জগতকে রস মণ্ডিত করে প্রকাশ করেন। ফলে বস্তু জগতের যে সব জিনিস এমনিতে কদর্য বলে মনে হয় সাহিত্যিকের প্রকাশ নৈপুণ্যে তারা কদর্যতা বর্জিত হয়ে এক অপরূপ সুষমা লাভ করে। শিল্পীকে এতকাল সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী বলে মানতাম। তিনি যদি তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধুমাত্র বস্তুর কদর্য দিকটার প্রতিই তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখেন তবে শিল্পীর মর্যাদা তাঁকে দেওয়া যেতে পারে না। আলোচ্য বাস্তিকগ্রস্ত-বাস্তববাদী (বা ব্যবসায়ী?) সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য সাহিত্যের তত্ত্ব ও সত্য সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে—"সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। হঠাৎ সে বস্তু যদি এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে করে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।"

মানুষের মধ্যে পশুত্ব আছে। ষড়রিপুকে যিনি সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ মানব আর তাদের তাড়নায় যে আত্মসমর্পণ করে তাকেই আমরা পশু বলি। রিপুর তাড়নাকে সংযত রাখতে পারে বলেই মানুষ বিশুদ্ধ 'animal' নয় 'rational animal'। যে পারে না সে বিশুদ্ধ 'জন্তু'। সাহিত্য মানুষকে কল্যাণের পথ দেখায়, তাকে উন্নত, মহৎ করে তোলে। কিন্তু যে সাহিত্য শুধুমাত্র পশুসুলভ বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করে, মনে পশুসুলভ উত্তেজনা এনে দেয় আর তাকেই আনন্দ বলে প্রচার করতে চায় তাই হচ্ছে যথার্থ অশ্লীল।

নগ্নতা মাত্রেই কিন্তু অশ্লীল নয়। নগ্নতারও একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। নগ্ন দেহের মধ্যে অনাবৃত সুষমা—একটি সারল্যের আবরণ আছে। যা কদর্য তাই হচ্ছে অশ্লীল। অর্থাৎ যখন বাইরের ভদ্র বেশধারী তথাকথিত শিক্ষিত মানুষকে বিশেষ একটি উত্তেজনার মুহূর্তে আংশিক ভাবে ইচ্ছাকৃত নগ্ন দেখানো হয় তখনই তা কদর্য ও বীভৎস হয়ে ওঠে—আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে পীড়া দেয়—আমাদের রুচি বোধকে তীব্র কষাঘাত করে। সাহিত্যের মধ্যে এই অভব্যতাই ( Vulgarity ) আমাদের আলোচনা বিষয়।

এই সব লেখকদের অবশ্য পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকের অভাব নাই। কিছু উন্মার্গগামী শিল্পী-সাহিত্যিক সমালোচক এই ন্যক্কার জনক শিল্প সৃষ্টির উগ্র সমর্থক। এঁদের মতে জীবন রূপায়নই যখন সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন এর কোন দিকই বাদ দেওয়া চলে না। কাজেই তাঁরা মনস্তত্ত্বের সূত্র ধরে বিবাহের প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা থেকে আত্মরতি পর্যন্ত সব কিছুই নির্লজ্জ ইতরতার সঙ্গে বর্ণনার পক্ষপাতী। এঁরা রাস্তার নর্দমার ময়লার অস্তিত্ব জানাতে পথিকের নাকে-মুখে সেই ময়লা গুঁজে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ জানেন না আর জানলেও সে পথ ( আভাস, ইঙ্গিত ইত্যাদি ) ষোল আনা সত্য বা বাস্তব নয় বলে তা গ্রহণ করেন না। এঁরা স্বমত সমর্থনের জন্য যুক্তি দেখান যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যসাহিত্যে, সংস্কৃতে এবং আদি ও আদি-মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার অভাব নাই। এঁদের এই মনোভাব একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে বিশেষ করে রস বিচার এবং সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। প্রথমত বেদ, পুরাণ ধর্মশাস্ত্র। সুতরাং

বৈদিক সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান প্রশ্নের সীমারেখার মধ্যেই আনতে পারি না। এরপর আসে রামায়ণ মহাভারতের কথা। এ দুটি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এতে নগ্নতা, যৌন সম্পর্ক এবং দেহ মিলনের বর্ণনাও আছে কিন্তু সে সবকে তো অশ্লীল বলা যায় না কেন না সে সব বর্ণনা সামগ্রিক জীবনানুভূতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গমাত্র। যেখানে সমগ্র জীবনটাই স্থান পেয়েছে তাতে আর শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্ন থাকে না। সেখানে আছে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের—আছে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের—আছে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বর্ণনা। আছে একটা সমগ্র যুগের একটা সমগ্র জাতির জীবনেতিহাসের কথা।

এবার আসা যাক কালিদাসে। কালিদাস প্রেমকে দেখেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে। সাহিত্য সুন্দর তাই সৌন্দর্যের কবি কালিদাস নরনারীর মিলনের মধ্যে দেখেছিলেন সৌন্দর্যের অভিসার। তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশী', 'শকুন্তলা', 'মেঘদূতে'র বিভিন্ন স্থানে, 'রঘুবংশে'র 'অগ্নিবর্ণ শৃঙ্গার' নামক শেষ সর্গে তিনি কামকলা ও ভোগ বিলাসের বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাতে সংযম বোধের পরিচয় আছে। তাঁর আদিরসের কবিতায় মনোবিকারের লেশ মাত্র নাই—চিত্র সৌন্দর্যই সেখানে প্রধান। দু'একটি উদাহরণ, যেমন—নারীর দেহ রূপের বর্ণনা—

"আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুনার্ক রাগম্।
পর্যাপ্ত পুষ্প স্তবকা বনত্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥"

"স্তন ভারে নতকায় ঈষত অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো॥"
(রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ)

মেঘদূত—উত্তরমেঘ ২১শ শ্লোক :

"তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

শ্রোণী ভারাদলস গমনা স্তোক নম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতী বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ ॥"

"তন্বী তনু, বর্ণ শ্যামা, দন্ত তুষার শিখর হেন,
রক্ত বরণ ওষ্ঠ অধর পক্ক রাঙা বিম্ব যেন।
শীর্ণ কটি, গভীর নাভি, এস্তা মৃগীর তুল্য দিঠি,
নিবিড় পিতম্বেরই ভারে অলস মৃদু যার গতিটি।
নিটোল দুটি স্তনের চাপে ঈষৎ নত অঙ্গ তারি,
বিধির আদি সৃষ্টি যেন সেই যুবতীই প্রথম নারী।"

( নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ )

আবার ভোগ বিলাসের চিত্র—মেঘদূত—উত্তর মেঘ ৭ম শ্লোক :

"নীবি বন্ধোচ্ছ্বসিত শিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদ নিভৃত করেষাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অচিন্তজ্ঞানভি মুখমপি প্রাপ্য রত্ন প্রদীপান্
হ্রী মূঢ়ানাং ভবতি বিফল প্রেরণা চূর্ণ মুষ্টিঃ ॥"

"শিথিল হেরি নীরব বাঁধন বল্লভেরা যেথায় এসে
প্রিয়ার কটির ক্ষৌম বসন ক্ষিপ্র করে টানত হেসে।
সরম রাঙা বিম্বাধরা মুষ্টিভরা চূর্ণ যার
রত্ন প্রদীপ নিবিয়ে বৃথা লজ্জাটুকু ঢাকতে চায়।"

( নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ )

এবারে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' দেখা যাক্ ; ৪র্থ পদ—

"তি অদ্ধা চাপি জোইনি দে অঙ্ক বালী।
কমল কুলিশ ঘাটি করহ বি আলী ॥
... ... ...
ভনই গুণ্ডরী অম্ হে কুন্দুরে বীরা।
নর অ নারী মাঝেঁ উত্তিল চীরা ॥"

মর্মার্থ :—"এখানে পরিশুদ্ধ ধৃতিকা নৈরাত্মাকে যোগিনী বলা হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধাব ধৃতিকা নৈরাত্মার প্রকৃতি এই যে, তিনি ললনা-রসনা

অবধূতিকা নাম্নী প্রধান তিনটি নাড়ীকে চাপিয়া নিরাভাস করিয়া অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহক-গ্রহণ ভাব নাশ করিয়া সাধককে নিজের অভিজ্ঞান অর্থাৎ নৈরাত্মতা প্রদান করেন, এবং তাহা রক্ষাও করেন, অথবা আনন্দ দান করেন এবং সাধকের অভ্যাসগুণে তাহাকে আশ্বাসিত করেন। অতএব ওহে সাধক, তুমি বজ্রপদ্ম সংযোগে অর্থাৎ চিত্ত শূন্যতায় পূর্ণ করিয়া সহজানন্দ লাভ করত কাল রহিত অবস্থায় অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে মহামুদ্রা রূপ নির্বাণের সাক্ষাৎ লাভ কর। ইত্যাদি। ( মনীন্দ্র মোহন বসু কৃত )

কিন্তু এ তো শ্রোতাদের মন ভোলাবার সস্তা চটকদার কৌশল নয়। যাঁরা এ গান লিখেছেন তাঁরা গৃহস্থ নন—বৈরাগী সহজ সিদ্ধ গুরু আর যাঁদের জন্য লিখেছেন তাঁরাও অগৃহী—সহজ সাধক। তাঁদের অনেকে তান্ত্রিক সাধনা করতেন—হয়ত নারী নিয়েও সাধনা করতেন। সেই সাধনার ইঙ্গিত বহন করছে তাঁদের অধ্যাত্ম সঙ্গীত চর্যাগান।

আবার জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্য দুখানিকেও রুচিহীনতা ও অশ্লীলতার জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে। তৎকালীন সাহিত্যাদর্শ ও সমাজ জীবন পর্যালোচনা করলে এ মত সমর্থন করা যায় না। ডঃ সুকুমার সেনের মতে—"তবে ইহার জন্য কবি দায়ী ততটা নহেন, যতটা দায়ী তখনকার শিল্পাদর্শ ও সাহিত্যরুচি।" ডঃ নিহাররঞ্জন রায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার উৎকৃষ্ট কাব্য-নিদর্শন।

আসল কথা এসব কাব্যে যতটা নগ্নতা, দেহসম্ভোগ চিত্র বা রতি বিলাস ইত্যাদি থাক না কেন সংশ্লিষ্ট কবিগণ সে সবকে অলঙ্কার ও ছন্দের স্তবকে মুড়ে অতি আলগোছে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন আর এই সব কাব্যের ব্যঞ্জনা পাঠকের মনকে নিয়ে গেছে এ সকল চিন্তা ভাবনার বাইরে এক অতীন্দ্রিয় লোকে—মনের একটা বিশেষ স্তরে—যেখানে শ্লীল-অশ্লীল প্রশ্নই অবান্তর। তাছাড়া আরও একটা বড় কথা যে সে যুগের সে সব সাহিত্য দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার পাঠের জন্য ছিল না। কেননা নারী ও কিশোররা সে সব পাঠে সাধারণতঃ বিরত থাকতো। অতএব শুধু সমাজের বয়স্ক পুরুষদের জন্য যে সব সাহিত্য সৃষ্টি তাতে তো ওরকম বর্ণনায় অশ্লীলতার

প্রশ্ন ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যিক ও তার পৃষ্ঠপোষক সমালোচকগণ ভেবে দেখেছেন কি তাঁদের যে সব আলোড়ন সৃষ্টিকারী, পত্র-পত্রিকার পূজা সংখ্যার কলেবর স্ফীতকারী উপন্যাসগুলি যখন নয়ন-মনোহর অঙ্গ সজ্জা নিয়ে প্রকাশিত হয় তখন তার পাঠক সংখ্যার মধ্যে নারী এবং কিশোরের সংখ্যা কত? এমন কি যে নামকরা সাহিত্যিক আদালতে অন্য একটি অশ্লীল বইএর মামলার সাক্ষী দিতে গিয়ে বলেন, যে সে উপন্যাস তাঁর মনে হয়েছে অশ্লীল নয় তখন সেই বিদগ্ধ সাহিত্যিক কি ভেবে দেখেছেন যে সে উপন্যাস ১৭ থেকে ২০ বছরের স্বল্প পরিণত বুদ্ধি-সম্পন্ন বাঙালী কিশোরের মনে কি ভাব জাগাতে পারে?

সাহিত্যে অশ্লীলতার চেয়েও বড় দোষ হচ্ছে—ভাষা ও শব্দ প্রয়োগে গ্রাম্যতা, যাকে ইংরাজীতে বোধহয় vulgarity বলা হয়। আধুনিক উপন্যাস-গুলির কোন কোনটায় যখন দৈহিক ক্রিয়াদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং গ্রাম্য শব্দাবলীর যথেচ্ছ প্রয়োগ করা হয়েছে তখন তাঁরা কি সাহিত্যিক মন নিয়ে তা করেছেন? শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে জাহাজের খোলের যাত্রীদের বমণ এবং অন্য দুটি দৈহিক ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সে বর্ণনাকে যে ভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে পাঠকের মনে সে বর্ণনা কি জুগুপ্সার ভাব জাগ্রত করে বা লজ্জার ঘৃণায় কি পাঠকের মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়? উপস্থাপন রীতি ও শব্দ প্রয়োগ কৌশলে সে সব বর্ণনা সাহিত্যে চলে গেছে। বিতর্কিত উপন্যাসগুলিতে কি সে গুণ রক্ষিত হয়েছে?

পরিশেষে বড় কথা এই যে সাহিত্যের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক মহাকাল সেখানে কোন ফাঁকি চলবে না, সৌখিন-নকল-মজদুরী সেখানে অচল। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য দেশে ও এ দেশে মহাকাল বিচারকের আসনে বসে তার চরম রায়দান করেছে—আবারও করবে কেননা সে এখনও অবসর গ্রহণ করেনি। আপাততঃ তাঁদের কিন্তু একটি সাবধান বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে—

'সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি,
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখিন মজদুরী।

# আতুর ॥ বিমল কর

বছর খানেক আগের কথা, একদিন একটু রাত করে কোন আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। ফেরার পথটা বেশ লম্বা। ঘণ্টা খানেকেরও বেশী বাস যাত্রা। রাসবিহারির মোড় থেকে দু'নম্বর বাসে দোতলায় উঠে সামনের দিকে বসে আছি। আমার সামনের সিটে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। অল্পস্বল্প বৃষ্টি হয়েছিল সন্ধ্যের দিকে, সিনেমার সন্ধ্যের শো ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ, দোতলায় তেমন কিছু ভিড় ছিল না। যেটুকু ছিল শুভবাবুর বাজারের কাজে তাও থাকলো না। আমার সিটে আমি একলা। সামনের সিটে যে যুগল বসেছিল তাদের মুখ দেখতে না পেলেও মোটামুটি অনুপাতে পারছিলাম ছেলেটির বয়স বেশি না, যুবক বলতে যা বুঝায় তাই। মেয়েটির হাবভাব দেখলে তাকে তরুণী বলে মনে হচ্ছিল। কদাচিত ওরা ঘাড় মাথা ফেরালে মুখের সামান্য দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার সামনে অনৈক যুবক ও অনৈকা যুবতী সহযাত্রী যে কথাবার্তা বলছিল তা আমার কানে আসছিল, কোনো কোনো কথা অবশ্য শুনতে পাচ্ছিলাম না, অনুমান করে নিতে হচ্ছিল। যাই হউক, ওদের আলাপ আমায় কৌতূহলী করছিল এবং এখনো মাঝে মাঝে সে সব কথা মনে পড়ে। আপাততঃ তাদের আলাপের কথাই নিজের মত করে বলি; আশা করি উভয়ের আলাপ থেকে একালের একটি ছবি ফুটে উঠবে। সুবিধার্থে ছেলেটি ও মেয়েটির নাম দেওয়া গেল, অনিল ও মায়া।

অনিল—অত তাড়া!

মায়া—তারকমে দিচ্ছে কে?

অনিল—তা হলেও একশো তিরিশ খুব বেশী। দেড়খানা ঘর, কমনবাথ ……টু মাচ। তুমি অন্য কোথাও খোঁজ করো।

মায়া—দেখি। এখানে একটা সুবিধে, আমার স্কুলটা কাছে।

অনিল—স্কুলে তুমি একশো টাকা পাও, একশো তিরিশ ভাড়া দেবে? পাগল!

মা—বিনুদিকে নিয়ে নেবো সঙ্গে—তার ছোট ঘরটা হলেই চলে যাবে, চল্লিশ পঞ্চাশ যা দেয়।

অ—তোমার স্কুল তোমায় বি-টি তে পাঠাচ্ছে না কেন?

মা—তদ্বির নেই।

অনিল—( হেসে ) তদ্বির করো একটু ·····

মা—করছি তো। সেক্রেটারী আবার আমাদের মতন মেয়েদের পছন্দ করে না।

অ—কেন?

মা—দেখতে ভাল না।

অনিল—( একটু চুপ করে থেকে হেসে ) ·····আমি তোমাদের স্কুলের সেক্রেটারী হলে কি হত?

মা—আমার চাকরী করা হত না, আর কি হত!

অ—ফাইন। বেশ বলেছ।

মা—( হাসির গলায় ) তখন অবশ্য তোমার চাকুরী করতে হত।

অ—আরে সে চাকুরীতে দিন দিন ফুলতে·····

মা—আমার স্কুলে দরকার নেই। বাজে কথা থাক, তুমি এবার একটা গতি করো।

অ—( খানিক সময় চুপ করে থাকলো ) কি করবো কিছুই বুঝতে পারি না। আমার লাক্ খুব খারাপ। লাষ্ট তিন বছর শুধু টেমপোরারি হয়ে কাজ করছি, আজ এখানে কাল সেখানে। রাগের মাথায় তখন স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে ভুল করেছি বুঝলে। বাজার খুব খারাপ।

মা—সেই চাকরিটার কি হল?

অ—হল না, ধরবার কাউকে পেলাম না।

মা—তোমার না সব কেমাস বন্ধু ছিল ···

অ—বন্ধুদের কথা বাদ দাও; ও শালারা শুধু বড় বড় কথা বলে; কাজে কিছু নয়।

মা—সে কি অত বন্ধু অন্ধ প্রাণ ছিল ···

অ—এখন আর নাই ; এখন তোমাকে ছাড়া কাউকে চিনি না।

মা—ইরার্কি···

অ—( একটু থেমে ) সিরিয়াসলি একটা একটা কথা বোলবো ?

মা—বল, কে আটকাচ্ছে।

অ—আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমাদের এই জেনারেশনটা একটা বড় রকমের ওয়েষ্টেজ বুঝলে ?

অ—ঠাট্টা নয়। আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের থাকা আর না থাকার কোন দাম নেই। আমরা আছি এই পর্যন্ত, জন্মে গিয়েছিলাম বলে থেকে যাচ্ছি, কোনো শালা কেয়ার করে না, গ্রাহ্য করে না। যাদের বাপ মামা এদিকে ওদিকে আছে তারা দু'দশজন কেরিয়ার করে দিচ্ছে, বাকি সব বগড়াচ্ছে আমার মতন।

মা—আ, একটু ধীরে কথা বলতে পারো না ?

অ—পারি, কিন্তু কেন বলব ? সত্যি কথাটাই বলছি। আমাদের জন্যে কে কেয়ার করছে যে আমাদের কেয়ার করতে হবে। ভদ্রলোকের ছেলে, না হোক বি-এস-সি পাস করেছি, মিলের ধুতি আর ছাওলুমের কাপড়ের পাঞ্জাবী পরে কাটিয়ে দিলাম, নেশা বলতে চারমিনার। বাড়িতে পোস্ট, বাবার ব্লাডপ্রেসার, মা দু'দু'বার মরতে মরতে বেঁচে গেছে টাইফয়েডে, আশি টাকার ফ্ল্যাটে থাকি সাতজনে, বুঝতেই পারছ কি ভাবে থাকি। ঘুষ খাবার মত স্কোপ নেই, কলেজের ডিমোনেষ্টার, ছেলেগুলো সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই চায়, হাঁ রাম ইজ্জত দেখছ !

মা—কি হল তোমার আজ ?

অ—ক্ষেপে গিয়েছি।

মা—হঠাৎ ?

অ—হঠাৎ নয় ; তোমার সঙ্গে চার বছরের ওপর এই সব হচ্ছে অথচ একটা হিল্লে করতে পারছি না। বয়স হয়ে গেছে ; তোমার অন্তত আটাশ। এরপর কবে আর বিয়ে করবো। করেই বা কি হবে—

মা—করতে পারবে কিনা তাই বা কে জানে !

অ—ঠাট্টা নয়, সত্যিই হয়ত পারব না। আমি দিন দিন যত দেখছি, সিক হয়ে পড়ছি। শালা সুন্দরবন পর্যন্ত এঁদো জমির দ্বিগুণ দাম বেড়ে

গেল, আমাদের শুধু দাম দিল না কেউ দেশের কি হোল।···কে তোর। কাছে মিনিস্ট্রি চাচ্ছে বাবা? ভদ্রলোকের নিরীহ ছেলে, একটু ভদ্রলোকের মতন থাকার ব্যবস্থা যাতে হয় সে ব্যবস্থা করে দে। মার্কস চাইছি না। খাটি এ প্রেস যেখানে মেহনত করবো—ন্যায্য মূল্য পাব মেহনতের। (একটু থেমে) মানুষগুলো আজকাল লোফারি করতে করতে কেমন হয়ে গেছে দেখছ, বীট্ট, ট্রামে বাসে, সিনেমায়, রাস্তায়, মিটিংয়ে-মিছিলে যেদিকে তাকাবে দেখবে ভদ্রলোকের ধুতি পাঞ্জাবী, শার্ট প্যান্ট পরা চেহারার ওপরে পশুর মুখ। মারছে ধরছে, গালাগাল দিচ্ছে, মেয়েদের গা টিপে দিচ্ছে, মেয়েরা একটু চোখ টিপে দিল,—ওদিকে বোমা, গুলি, ট্রামবাস পোড়া-নরক—একেবারে নরক।

মা—তুমি থামবে?

অনিল—নেভার। থামব কেন? আমরা বরবাদ হয়ে গেলাম আর তুমি থামতে বলছ! থামব না—যা মুখে আসবে বলে যাব। চেঁচাব। আমি, আমি তোমায় বলছি, আজ বিশ পঁচিশ বছরে আমাদের চরিত্র সমস্ত দিক থেকে বদলে গেছে; আমরা ক্রমশই বিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। কারও বাপের সাধ্য নাই আমাদের বাঁচায়। আরও দশ বিশটা বছর যাক তখন দেখবে আমরা আমাদের দাঁত নোখ দিয়ে কেমন খেয়োখেয়ি শুরু করে দিয়েছি, রাস্তার কুকুরের মতন।

মা—তুমি চুপ না করলে আমি নেমে যাব।

অ—(বাধ্য হয়ে চুপ করল)···তুমি···

মা—আজ কি হয়েছে তোমার? মাইনের টাকা কেটেছে?

অ—ওইতো রাইনে আবার কাটবে কি?

মা—তবে চুপ করে থাক। অন্য কথা বলো।

অ—পঞ্চবার্ষিকীর কথা বলবো?

মা—(হেসে ফেলল)...বেসরকারী পঞ্চবার্ষিকী হলে বলতে পার।

অ—(এবার হাসল) বেসরকারী পঞ্চবার্ষিকিতেও আমি সব যু যু দেখছি। তোমার সঙ্গে আমার একটা এগ্রিমেন্ট করতে হবে। তাতে লিখে দেব: সাধ আছে—সাধ্য নাই, মার্জনা করো।

মা—করছি, আর কি !

অ—একদিন করতেই হবে. আমাদের এসব প্রেম-ফ্রেম নিয়ে কাব্য করা যায়, নাথিং মোর।...তুমি স্কুলের সেক্রেটারীটাকে লাগাও, বি-টি-তে ঢুকে পড়। আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসবো, টাকা কাকা ধার নেব। তোমার উন্নতিতেই আমার লাভ·····

মা—( ছেলেটির কাধে ঠেলা দিল ) তোমার অবনতিতে আমার কষ্ট। ···নাও ওঠো আমি নামব।

অমল—আমায় নামতে হবে ?

মা—বারে, কত রাত হয়ে গেছে। বাড়ি পৌছে দেবে না ?

অ—তবে চলো।...এ শালা আর ভাল লাগে না। তোমায় বাড়ি পৌছে দিয়ে টঙ টঙ করে হাঁটব !

মা—বেশ তো এমন একটা বাড়ি করো সেখানে পৌছে দিয়ে আর ফিরতে হবে না।

অ—( দীর্ঘশ্বাস ফেলে ) নো চান্স।

---

জাগরী প্রকাশনী
৯এ, বহুবাজার স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

# চাকরি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

চাকরিতে কিছুতেই উন্নতি হচ্ছে না ভবতোষের। তিনশো ত্রিশ টাকাতে গিয়ে ঠেকে আছে। একেবারে ত্রিশঙ্কুর মত। নট নড়ন চড়ন। ত্রিশে গিয়ে ত্রিশূলের মত ঠেকে আছে একেবারে। প্রতি বছর মে মাসে ইন্‌ক্রিমেন্ট হয় ভবতোষদের অফিসে। ভবতোষদের কোম্পানি আগে ছিল সাহেবদের। এখন এক মাড়োয়ারী সেটি কিনে নিয়েছেন। এখানে ইন্‌ক্রিমেন্ট হয় গোপনে। একজন একজন করে পাশের ঘরে ডাক পড়ে। সকলে ফিরে আসে হাসি হাসি মুখে। কিন্তু ভবতোষ?

বস বলেন, তোমার কাজ কিন্তু হচ্ছে না ভবতোষ। এ রকম করলে চাকরি থাকবে না। ভবতোষ মুখ কাঁচুমাচু করে বলে,—স্যার——বস বলে, কোন কথা শুনতে চাই না, ইমপ্রুভ অর রিজাইন।

ভবতোষ কাঁদো কাঁদো মুখে ফিরে আসে। ওর এক সহকর্মী মদন বলে, তোর চাকরীতে উন্নতি হবে কি করে, তেল দিয়েছিস কোনদিনও?

—ভবতোষ বলে, যথেষ্ট, কিন্তু আমার তেল খাচ্ছেন না বস, যেমন ধর, আমি বলতে গিয়েছি, স্যার ঠিক বলেছেন,—অমনি বস রেগে গিয়ে বলেছেন, তুমি কথা বলতে এসো না। তুমি এর কি বোঝ? অথবা ধর আমি ওর বাড়িতে যদি যাই, যদি গিয়ে বলি এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। বস বিরক্ত হয়ে, টেলিফোনে উত্তর দিতে গিয়ে শুনিয়ে শুনিয়েই কাউকে বলেন, এই ছুটির দিনেও বাড়ীতে স্থির বুঝলেন না। একটু যে নিরিবিলি কথা বলব তারও উপায় নেই।

মদন বলে, তাইতো, তাহলে তো ভাবিয়ে তুললে দেখছি। ওই যে মুখ্যু শ্যামলাল, তিনবার ফেল করে চারবারের বার পাশ করেছে সে হয়ে

গেল ম্যানেজার। আর তুই যে সুপারভাইজার, সেই সুপারভাইজার। কোন সুপারভাইস আছে না কি তোর ?

মানে ? ভবতোষ জিজ্ঞাসা করে।

মানে এই মালফাল খাওয়ার অভ্যেস ? মানে চরিত্রদোষ যাকে বলে।

না ভাই, পানে কোন আসক্তি নেই আমার। পানের ইংরিজী তো বিটল। এমন কি বিটলদেও আমি পছন্দ করি না। পর দারকে মাতৃবৎ দেখি। আর অপরের দ্বারে যাবার কি দরকার আমার। কেন আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরতে যাব ? আমার কি নিজের ঘর বাড়ী নেই ? ভবতোষ বলে।

ভেবে দেখ ভালো করে, মদন বলে। ভেবে দেখো অন্য কোন ছিদ্র আছে কি না—নিজের অজ্ঞতাও তো অপরাধ করে ফেলে মানুষ! ভেবে দেখ, কাজে ফাঁকি পড়েছে কি না। কোন ফাঁকে কি হয়তো ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভবতোষ আকাশ পাতাল ভাবছে। ভাবতে ভাবতে বলে মনে পড়েছে, মনে পড়েছে।

: কি ব্যাপার ?

: মনে পড়েছে, ভবতোষ বলে, অফিসে আসতে প্রায় লেট হয়ে যায় আমার। হয়ত এটাই আমার সব চেয়ে বড় অপরাধ হয়ে যাচ্ছে। কে না জানে, 'বিলম্বে হতাশ হইবেন'—এটা একটা চালু শব্দ। শব্দ না বলে শব্দকল্পদ্রুম বলা যেতে পারে। এই বিলম্বের জন্যই হতাশ হচ্ছে ভবতোষ। মদন বলে, ঠিক। এই জন্যই হতাশ হতে হচ্ছে। বিলম্বই শেষ কালে লম্বা বাঁশে পরিণত হচ্ছে।

অতএব পরের দিন থেকে আধঘন্টা আগে অফিসে আসতে আরম্ভ করল ভবতোষ। সবার আগে অফিসে এসে ফাইল নিয়ে বসল। তারপর সে মাঝে হাসি হাসি মুখ করে বসের ঘরে ঢুকল ভবতোষ। কিন্তু বস বললেন, তোমার ব্যবহারে খুব দুঃখিত ভবতোষ। তুমি সবার আগে অফিসে আস, সবার পরে অফিস থেকে যাও। এতে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তোমার কোন মতলব আছে। তোমার জন্য কোমপানির এক্সট্রা ইলেট্রিসিটি খরচ হয়। দারোয়ানদেও সকাল সকাল আসতে হয়।

তারা যদি একটা ডিমাণ্ড করে কোমপানিকে দিতেই হবে। একা একা তোমার এভাবে একটা কাজ করা বন্ধ করতে হবে।

ভবতোষ মাথা চুলকোতে চুলকোতে ফিরে আসে।

এবারও ইনক্রিমেণ্ট আর প্রমোশন হয়েছে ক'জনের। সকলের পুরস্কার —তার ভাগ্যেই তিরস্কার।

এবার থেকে কাঁটায় কাঁটায় অফিসে আসতে আরম্ভ করল ভবতোষ। আর বাড়ী ফিরতে আরম্ভ করলো কাঁটায় কাঁটায়।

কিন্তু কাজ করতে লাগল মুখ না তুলে। দুজনের কাজ একাই করতে লাগলো। দরকার হলে বাড়ি থেকে কাজ করে আনত। এবার উন্নতি অবধারিত।

কিন্তু মে মাসে বস বললেন, শোন ভবতোষ তোমাকে এই শেষ ওয়ার্নিং দিচ্ছি।

কেন স্যার?

এভাবে একনাগাড়ে কাজ করে তুমি কোমপানিকে জব্দ করার চেষ্টা করছ?

জব্দ? কোমপানিকে? ভবতোষ চোখ কপালে তোলে। বস বলেন, হ্যাঁ, তোমার যদি অসুখ হয় লোকে বলবে কোমপানি এত খাটায় যে একটা লোককে খাটাতে খাটাতে মেরেই ফেলে দিল। এতে কমপানির বদনাম। ইউনিয়ন এটা নিয়ে ইস্যু করতে পারে। তোমার বউকে দিয়ে মামলা করতে পারে। এই লাষ্ট ওয়ার্নিং—'ডোণ্ট গো বিয়ণ্ড ইওর লিমিটেশন'।

ভবতোষ এবারে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। সে ঠিক করে আর কাজ করবে না। তার উদ্যোগ নষ্ট হয়ে গেছে। তার উন্নতি হবে না। ত্রিশঙ্কুর সর্গলাভ ঘটবে না। সে শঙ্কিত হয় মনে মনে। ভবতোষ তাই এখন থেকে ঠিক সময় অফিসে যায় বটে তবে কাজ কর্ম আর করে না। ফাইল খুলে পলিটিকস না হয় খেলার খবর আলোচনা করে। ঘন ঘন চা জল আর পান আনায়। টেবিলে চশমা রেখে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখে সে এখন দারুন হতাশাগ্রস্ত। ভাবছে তাদের সহকর্মীদের মত পার্ট টাইম ব্যবস্থা করবে কিনা।

মে মাসে বসের ঘরে আবার ডাক পড়ে। ভবতোষ এবার তৈরী হয়েই

যায়। সে ঠিক করেছে বস এবার খুব বেশী যদি অপমান করে রেজিগনেশন লেটার ফেলে দেবে মুখের ওপর।

কিন্তু না। বস এবার বসতে বলেন।

: বোস বোস ভবতোষ।

ভবতোষ বসে। গায়ে চিমটি কেটে দেখে। হাঁা এখনও সে বহাল তবিয়তেই আছে। এটি স্বপ্ন নয়।

বস বলেন, দ্যাখো ভবতোষ। গত এক বছরে তোমার কাজে কোমপানি সন্তুষ্ট হয়েছে। দেখলাম, তোমার মধ্যে অ্যামবিশান নেই। তুমি পলিটিক্স করতে চাওনা। তোমার মধ্যে একজন সৎ দক্ষ কর্তব্য-পরায়ণ কর্মীর প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই কোমপানি খুশী হয়ে এই মাস থেকে তোমাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার করে দিল। দুশো টাকা বেতন বাড়লো তোমার। কি খুশী তো?

[ শিব্রাম টাইল অনুসরণে ]


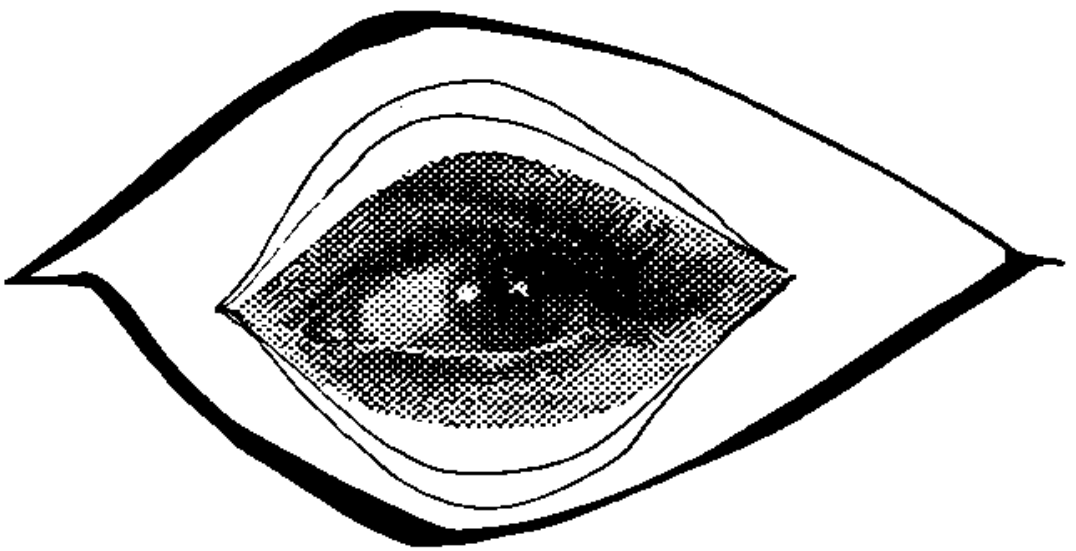

*You*
*can hardly*
*take*
*your eyes*
*off*

*When Eagles do a job, it draws universal attention!*

# নাম নিয়ে

তুষারকান্তি দে

নামে কি বা আসে যায়—কথাটা শেষ অবধি ধোপে টেঁকে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ নাম নিয়ে নাকাল মানুষ চিরকালই হচ্ছে। বিশেষ করে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নামকরণ ব্যাপারে মানুষ মাথা ঘামাচ্ছে আরও বেশি করে। নবজাতকের কান্নার সুর ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সবাই নামকরণের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় খোকা বা খুকু। অনেকের দুর্ভাগ্য খুকুর মা বা খোকার বাবা হওয়ার পরও তার জন্মলগ্নের নাম আষ্টে পৃষ্ঠে লজ্জার মতই লেগে থাকে। কিন্তু সংসারের পুরানোরা এক কথাতেই নাম সমস্যাটি মিটিয়ে দিতে পারেন তাঁদের আরাধ্য দেবদেবীর নাম নবজাতকটির ঘাড়ে চাপিয়ে। কিন্তু যুগ এখন বিংশ শতকের মধ্যপাদ পেরিয়ে গেছে—ঘরের আঙিনাও তাই সারা বিশ্বে প্রসারিত। নবীন মনেও তাই প্রগতির দোলা। সে খোঁজে অন্য নাম, নামের অন্য মানে। মোটকথা তারা চায় নামটা যেন সুন্দর হয়। নামটা যেন এযুগের হয়। সর্বোপরি যেন নতুন হয়।

শুধু কি মানুষ? পোষা কুকুর থেকে নতুন তৈরী বাড়ী, সদ্যজাত শিল্পনগরী থেকে রেলের ইঞ্জিন, রাস্তার সেতু প্রভৃতি সবেরই নামকরণ নিয়ে মানুষের চিন্তার শেষ নেই। তাই আজকাল নাম ছাড়া আমরা কোন কিছুই কল্পনা করতে পারি না। সব কিছুরই একটা না একটা নাম আছে। কিন্তু এই সব নাম যদি খুব বড় হয় তাহলে বলতে বা ডাকতে একটু অসুবিধা হয়! তাই আমরা সাধারণত যদি কোন মেয়ের নাম 'অনুরাধা' হয় তাহলে তাকে 'অনু' অথবা 'রাধা' বলে ডাকি অথবা তাকে কোন তৃতীয় নামে ডাকি।

সেকালের সখীসমাজে তৃতীয় নামের বহুল প্রচার ছিল। আটপৌরে এবং পোশাকি দুটি নামই খারিজ করে অন্তরঙ্গতা আনতো 'চোখের বালি' আর

'আতুর নিশি' প্রভৃতি। একালীন সখাসখীরা পরস্পরকে কি নামে ডাকেন তা একান্তই ব্যক্তিগত, বহির্জগতের জানার কথা নয়। তবে মুখে উচ্চারিত হোক বা না হোক, মনে মনে আমরা সন্তবত একটি বিশেষ নাম প্রত্যেকটি মানুষকে দিয়ে থাকি।

নাম বড় হলে আমরা তাকে ছোট করে ডাকি। যেমন পণ্ডিত আবু রয়হান মুহম্মদ ইব্ন্ আহ্মদ আল-বিরূণী' কেবলমাত্র 'আল-বিরূণী' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু নাম যদি খুব বড় হয় তখন তাকে কি বলে ডাকব! এবং তাকে কত ছোট করব?

হাওয়াই দ্বীপ-পুঞ্জের রাজধানী হনলুলুর এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে একটি সুন্দরী মেয়ে, নিতান্তই দরকার না পড়লে তার নাম সই করা থেকে বিরত থাকার একটা মস্ত কারণ রয়েছে।

কিন্তু কেন? কারণ ওর হচ্ছে পৃথিবীর দীর্ঘতম নাম তার। ও নিজেই নিজের নামটা যে কি করে মনে রাখে সেটা ওর বন্ধুবান্ধবের কাছে একটা রহস্য মনে হলেও ও কিন্তু কখনো নিজের নামটা ভুল করেছে বলে শোনা যায়নি। দম বের করে দেবার মতো পঁয়ষট্টি অক্ষরযুক্ত নামটি হচ্ছে:

KUULEIKAILIAL
AHAOPIILANIWA
ILAUOKEKOAULU
MAHICHIEKEALA
OMAONAOPIIKEA.

অদ্ভুত এই নামটির অর্থ হচ্ছে: 'অধোগামী স্বর্গের আমার প্রেমের ধারা বনের সুন্দর পত্রাবলীকে স্নাত করে আর তার মধুর সৌরভ মেঘের পথকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।'

ইওরোপে দীর্ঘ পদবীযুক্ত নাম বহু পাওয়া যায় কিন্তু ঐ হাওয়াই মেয়েটির মতো দীর্ঘ কারুর নয়। দীর্ঘতম পদবী হচ্ছে এক গ্রীক পরিবারের এবং তাতে আছে ছত্রিশটি অক্ষর। সেটি হচ্ছে:

PAPPATHEODOR
OKOMANDORONI
COLUCOPOULAS.

১৯৬৭ সালে হায়দ্রাবাদের প্রাদেশিক রাজ্যসভায় নির্বাচন প্রার্থীদের একজনের নাম হচ্ছে : 'শ্রী কাকারলাল পুধি বিজয়রাঘব সত্যনারায়ণ পদ্মনাভ রাজু।'

সম্প্রতি মার্কিন পুস্তক প্রকাশক সাইমন এণ্ড সুষ্টার একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন। লেখকের নাম জর্জ কিগো। গল্পের বইটির নাম হল :

How to write ten different best sellers now in your spare time and become the first author on your block unless there is an author already living on your block in which case you will become the second author on your block and that's okay too and other stories.'

নিউজিল্যাণ্ডের একটি গ্রামের নাম ৮৩ অক্ষরযুক্ত। পৃথিবীতে এত দীর্ঘ নাম আর কোন জায়গায় নেই। দীর্ঘতম গ্রামের নামটি হচ্ছে :

T A U M A T A W N A K A T
A N G I H A N G A K O A U
O T A M A T E A T U R I P
U K A K A P I K I M A U N
G A H O R O N U R U P K A
I W H E N U A K I T A N A T A H U.

উত্তর পশ্চিম ওয়েলস এ রাজ্যের হলিহেড লাইনে ৫৮টি ইংরাজী হরফে একটি রেলষ্টেশন আছে। ষ্টেশনটির নাম হচ্ছে :

L L A N F G I R P W L L
C W Y N G Y M M G O G E
R Y C H W Y R D R O B W
Y L L L L A N T Y S I L
I O G O G O G O C H.

রেল ষ্টেশনটির পাশের বাজারটির নামও কম যায় না—ষ্টেশনটির নামের প্রথম ২০টি অক্ষর দিয়ে গাঁথা। বাজারটির নামেই হয়েছে ষ্টেশনের নাম-

করণ। দুঃখের কথা সম্প্রতি বিশ্বের দীর্ঘতম এই রেল ষ্টেশনটির নাম মানচিত্র হতে উঠে গেছে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য।

একটি ৪৬ অক্ষর যুক্ত গ্রামের নাম হচ্ছে :

PNEUMONOOUTTRAM
ICROSCOPICSILIC
OVOLCANOCINIOSIS.

আরও একটি ২৮ অক্ষর যুক্ত স্থানের নাম হচ্ছে :

ANTIDISESTABLI
SHMENHARIANISM.

ইংরাজী সাহিত্যে সবচেয়ে বড় অ-বৈজ্ঞানিক কথা ( longest non-scientific ward ) হচ্ছে ৩১ অক্ষর যুক্ত। কথাটা হচ্ছে :

PROANTIDISES
TABLISHMENTA
RIANISM.

সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম নাম হলো একটি বইয়ের। ক্ষুদ্রতম নাম উদ্ভাবন করেন স্বর্গত লেখক মরিস বেরিং। নিজের লেখা জীবনীমূলক একটি উপন্যাসের নামকরণ করেন শুধু মাত্র 'সি' (C)।

এডউইন নর্গ্যান রচিত একটি কবিতা বই-এর নাম হল শুধু মাত্র 'আর' (R) এই ইংরিজি অক্ষরটি। প্রকাশক হলেন ইউজিন গোরসিংগার প্রেস।

—০—


এই আনন্দ উৎসবে জানাই আপনাকে আমাদের
আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ভারত উলেন মিলস্ লিঃ

কলিকাতা-১

# আমার সঙ্গীত জীবন কথা

## কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মন ( এস-ডি-বর্মন )

১৯০৪ সালে কুমিল্লা জেলায় দুর্গাপূজার নবমী দিন আমার জন্ম। প্রথম লেখাপড়া সুরু হয় কুমিল্লার জেলা স্কুলে। ঐ বয়স থেকেই গান বাজনার দিকে আমার আগ্রহ। যাঁরা আমার স্কুলের বন্ধু ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের সবারেরই ললিতকলার প্রতি কম বেশী ঝোঁক ছিল।

যদিও কুমিল্লা তখন একটি ছোট্ট সহর তবু আগরতলা থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূর। আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। ওখানে গান বাজনার চর্চ্চাও ছিল যেমন, মানও তেমনি ছিল উঁচু। আমিও মাঝে মাঝেই আগরতলা যেতাম। তখনকার যুগে গান বাজনা শেখা লোকে ভাল চোখে দেখত না তবু আমার বাবা আমাকে কিছু বলতেন না। আমার যে সব বন্ধু বা সাথী এঁদের সহযোগিতায় সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন গানের জলসা বসত। কখনও আমার কখন বা হিমাংশু দত্তর বাড়ীতে।

সাধারণ মানুষের জীবনে থিয়েটার বায়স্কোপ ছিল না—যাত্রাগানই আনন্দ সৃষ্টি করত। কুমিল্লাতেও যাত্রাগান প্রায়ই হত। আকর্ষণও ছিল খুব। অভিভাবকদের লুকিয়ে রাত্রে বাড়ী থেকে চলে যেতাম সে গান শুনতে, এ নিয়ে অভিভাবকদের কাছে উত্তম মধ্যমও হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু আমার কানে যাত্রাগানের সুর খুবই মিষ্টি লাগত কারণ বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি তিন চারটে সুরের মিশ্রণে সে গানের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। অদ্ভুত পরিবেশসৃষ্টি করত সেই সুর। সাধারণতঃ সিনেমাও যা হয় আজকাল, যাত্রায় তা হত না। কাহিনীর বিষয় বস্তু আর সংলাপের সঙ্গে গানের কথার সুন্দর মিল ছিল। এই সময় আমার মনে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ছোটবেলা থেকেই মনে বড় আকাঙ্খা ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের (classical) গাইয়ে হিসেবে আমি খুব বড় হব, খুব নাম ডাক

হবে, আমার কিন্তু অনেকটা অজ্ঞাতসারেই আমি কেমন যেন ঐ লোক সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলাম। অবশ্য classical গান নিয়েই তখনও ব্যস্ত ছিলাম। আমার এই মনোভাবে কেউ কেউ বলতেন শিখছি যখন classical তখন লোকসঙ্গীতের প্রতি অত মন কেন? গীতিকার অরুণ ভট্টাচার্য্য আমাকে সমর্থন করতেন।

এই সময় আমি মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতাম, সে সময়ের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েদের গান বাজনা শুনতে। হরেন শীলের বাড়ীতে গানের আড্ডা বসত। হরেন শীল গান বাজনা অত্যন্ত ভালবাসতেন। মেজাজটাও অতি দিলদরিয়া ছিল। বাজনায় আর রেস খেলায় শেষকালে তিনি ফতুরও হয়ে গিয়েছিলেন। এঁর বাড়ী ছিল খুব সম্ভব পাথুরেঘাটায়। হরেন শীলের দিলদরিয়া মেজাজের একটা ঘটনা মনে আছে। বিখ্যাত সরোদীয় ওস্তাদ কেরামাতুল্লা খাঁ তাঁর ওস্তাদ ছিলেন। হরেন শীলের আঙুলে একটি অত্যন্ত দামী হীরের আংটি ছিল। একদিন কথাচ্ছলে ওস্তাদ কেরামাতুল্লা সেই আংটিটি দেখিয়ে বললেন—'আরে হরেন ইয়ে আঙুটি বহুত খাপসুরত হায়'। শীলমশায়, তৎক্ষণাৎ বললেন, ইসমে কিয়া হায় ওস্তাদ জী। আপ শকসে ইয়ে আঙুটি লিজিয়ে।' আংটিটি অত্যন্ত দামী থাকা সত্ত্বেও শীল মশায় অকুণ্ঠিত ভাবে ওস্তাদকে সেটি দিয়ে দিলেন। হরেন শীল খুব সম্ভব রাইচাঁদ বড়ালদের আত্মীয় ছিলেন। বছরে অন্ততঃ একবার করে লালচাঁদ বড়ালদের বাড়ীতে গানের আসর বসত। এই আসরে ভারতের নানান জায়গা থেকে বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়েরা আসতেন।

ঢাকা কুমিল্লার কলেজ জীবন শেষ করে M. A. পড়বার জন্যে আমি কলকাতায় আসি। কলকাতায় এসে কয়েকজন বিখ্যাত গুণী শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হই। শ্রীশ্যামলাল ক্ষেত্রী, বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাজিয়ে ইনি গোয়ালিয়রের রায় সাহেব গণপত রাওয়ের শিষ্য ছিলেন। অন্ধগায়ক শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এর কাছেই প্রথমে আমি গান শিখতে সুরু করি। শ্রী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, জমীর উদ্দীন খাঁ সাহেব এঁদের সঙ্গেও খুব পরিচিত হই। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে বাদল খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখছেন। খাঁ সাহেবের সঙ্গীতের

ধারাটি আমার বেশ ভাল লাগল। আমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম। বাড়ী ফিরে এসে ঐ ধারা অনুসরণ করে চর্চা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু মন আমার একেবারে ভেঙে পড়ল। ছোটকাল থেকেই ইচ্ছে ছিল খুব বড় গায়ক হব কিন্তু বড় গায়ক হতে গেলে ছোট-কাল থেকেই বড় ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত সাধনা সুরু করতে হয়। আমার জীবনে প্রথম থেকে সে সুযোগ সুবিধে হয়নি।

সে সময় থিয়েটারের যুগে 'নাচঘর' নামে এক খানি সাপ্তাহিক কাগজ বের হত। সম্পাদনা করতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। হেমেন্দ্র কুমার গান লিখতেন, সুর দিতেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। আমি "নাচঘর" প্রায়ই পড়তাম, একদিন অবসরসময়ে বারান্দায় বসে "নাচঘর" দেখছি হঠাৎ ছ' লাইনের একটি গান চোখে পড়ল। গুন গুন করে গেয়ে ফেললাম গানটি। সুরটি ভালই লাগল কানে, কেমন একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। মনে হল আমি সুর-শিল্পীও হতে পারি। তখনই সুধীরেন্দ্র সান্যালের কাছে ছুটে গেলাম, এর কাছে প্রায়ই সময় কাটাতাম—আমাদের আড্ডা বসত এর বাড়ীতে। গানখানি শুনে তিনি খুবই খুসী হলেন। উৎসাহ দিলেন, আরও বল্লেন—আমি সুর দিতে পারি। সাহস পেলাম, আরও দুতিন খানা গানের সুর দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র দেকে গেয়ে শোনালাম। তিনি অবশ্য শুনে সেদিন তেমন উৎসাহ দিলেন না এইজন্য যে সুর দেবার প্রয়োজন অনুযায়ী আয়োজনের আমার আরো দেরী আছে। হেমেন বাবুর লেখা গানে সুর দিয়েছি এ খবর তাঁর কানে যেতেই তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে ডেকে পাঠান। আমার মুখে তাঁর গান কখানি শুনে খুবই খুসী হলেন। নিজের উপর আমার অত্যন্ত আস্থা এল। সে সময় Calcutta Broadcasting Company নামে কলকাতায় একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। India Government তখনও এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন নি, এটি একটি Private প্রতিষ্ঠান। সুধীরেন্দ্র সান্যাল এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দেন। এখানেই আমি জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম গান গাইবার সুযোগ পাই। শুধু গান গাওয়া নয় পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ আটটি টাকা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়, কাগজে আমার নামও ছাপা হয়। সে এক স্মরণীয় দিন। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত

গানের বিনিময়ে অনেকের শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্থ পেয়েছি কিন্তু সেদিনের সেই প্রথম ৮৲ টাকা পাবার আনন্দের তুলনা বিরল—সে আনন্দ কখনই ভুলতে পারব না। সহরের জীবনে জাঁকজমক আছে, সৌন্দর্য আছে কিন্তু প্রাণ নেই। আমারও সহরজীবন একটুও ভাল লাগল না। তাই প্রায়ই আমার কুমিল্লার গ্রামে ছুটে যেতাম। গ্রামে যেয়ে মাঠে মাঠে পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতাম। আমার আর একটা নেশা ছিল মাছধরার। সারাদিন বসে মাছ ধরতে আমার ক্লান্তি আসত না। ত্রিপুরা জেলার একটি গ্রামে এই রকম একবার মাছ ধরতে যাই। মাছ ধরতে রাত হয়ে গেল। রাতে ফিরবার কোনও ট্রেন নেই, বাধ্য হয়েই রাজবাড়ীর কাছারীতে রাতকাটাবার ব্যবস্থা হল। জোছ্‌না রাত, আকাশ পরিষ্কার, বর্ষাকাল তবু বৃষ্টির লেশ ছিল না। শুয়ে আছি হঠাৎ দূর থেকে কানে ভেসে এল গানের সুর। কাছারীর দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম গ্রামের চাষি সম্প্রদায় এমনি ভাবে রাতে গান গায়। গানের সুরটির নেশা আমাকে পেয়ে বসল—আমি যেতে চাইলাম কিন্তু দারোয়ান জানালো এতে আমার সম্মানের হানি হ'তে পারে, আমি কেন ওখানে যাব? তবু আমি থাকতে পারলাম না—ঐ রাতেই গানের আসরে চলে গেলাম। দেখলাম একটা প্রকাণ্ড খোলা মাঠে দু'তিনশত লোক এক সাথে বসে গান গাইছে। একটি যুবক প্রথমে—আর সবাই পরে দোহা গাইছে। গানটির কথা আজও আমি ভুলিনি।

আল্লা মেঘ দে—পানি দে ছায়া দে
তুই আল্লা মেঘ দে—আসমান হইল টুডা টুডা
জমিন হইল ফাতা
মেঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে—পানি দিবো ক্যাতা…

সে যে কি সুন্দর পরিবেশ তা বোঝানো যায় না। আস্থায়ী বারে বারে ঘুরে আসছে, কোরাস্ হ'চ্ছে আল্লা মেঘ দে পানি দে। কোন বাদ্যযন্ত্র নেই খোলা আকাশ, কেবল তালের সময় হাতে তালি পড়ছে। সাম্প্রদায়িকতা বিষ তখন ছিল না, হিন্দু মুসলমানে একসাথে মিলে সে গান গাইছিল। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। ঐ লোক সঙ্গীত আমার সঙ্গীত জীবনের একটি দিক পরিষ্কার করে সামনে ধরে দিল। classical গানই

আমার প্রিয় ছিল এতদিন কিন্তু ত্রিপুরা জেলার একটি গ্রামের একরাতে ঐ গান শুনে লোকসঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমার এত বেড়ে গেল যে classical এর সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতের চর্চ্চার জন্যেও মন আমার ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এসময় কলকাতায় একটি স্বদেশী সঙ্গীত প্রতিষ্টান গড়ে ওঠে Hindusthan Recording company নামে। আমি কে, এল, সায়গল, অনুপম ঘটক, সজনীকান্ত মতিলাল, অনিল বিশ্বাস প্রভৃতি আরো অনেকে সে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম। সর্বপ্রথম হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শৈলেন রায়ের গান রেকর্ড করি। "ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের পথে যাই" এবং "এই পথে আজ এস প্রিয়া কোরো না আর ভুল" গান দুখানিই আমার প্রথম রেকর্ড। 'ডাকলে কোকিল' লেখেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'এই পথে আজ' লেখেন শৈলেন রায়। স্বর্গত অজয় ভট্টাচার্য্য তখন কুমিল্লার কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। গান লিখবার জন্যে আমি তাঁকে প্রথম কলকাতায় নিয়ে আসি। ১৯৩৪-৩৫ সালে আমি এলাহাবাদে All India Music Conference এ যোগ দিই। সেখানে আমিই সর্বপ্রথম বাঙলা গানের Demonstration দিয়ে প্রশংসা অর্জন করি। গানের কথা বাঙলা ছিল তবু সেখানকার হিন্দুস্থানী শ্রোতারা আমার গান অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনেছিলেন। ঐ সময় থেকেই আমি ইউ-পি ও বিহারের লোকসঙ্গীত চৈতী কাজরী দাদরা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে সুরু করি। বেনারসের বিসমিল্লা সানাই পার্টির বাজনাও ঘন্টার পর ঘন্টা মন দিয়ে শুনতাম। এদিকে বাঙলা দেশেও ভাটিয়ালী গান সংগ্রহ করতে সুরু করি। কবি জসীমউদ্দীন এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এ কারণে তাঁর কাছে আমি অত্যন্ত ঋণী। এই সময় থেকে আমার মনে একটা ইচ্ছা জাগল সঙ্গীত পরিচালনা করবার, কয়েকটি বাঙলা ছবির সঙ্গীত পরিচালনাও করলাম। ইংরেজী ১৯৩৪-৩৮ সাল পর্যান্ত শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এর সঙ্গে খুব সৌহার্দ্দ হয় এবং তাঁর কাছে গান শিখাতে সুরু করি। কাজী নজরুল ইসলামও আমার খুব বন্ধু ছিলেন। তাঁর লেখা দু'তিন খানা বিখ্যাত গান রেকর্ডও করেছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি ১৯৪৪ সালে আমি বম্বে রওনা দিই। ওখানে যাই Flimstan Companyএর Music Director হিসেবে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ইচ্ছে

আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। বাঙলা দেশে একমাত্র নিউ থিয়েটার্স ছাড়া হিন্দী ছবি খুবই কম বেরোত, অথচ নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার উপায় ছিল না কারণ সেখানে অন্যান্য Music Director ছিলেন। বাধ্য হয়েই আমাকে বোম্বে যেতে হল। হিন্দুস্তানের প্রথম ছবি আমার "শিকারী"। তারপর পর পর তিনখানা ছবিতে কাজ করি। Eight days, দোভাই, শবনাম্। এরপর Bombay Talkies-এ যোগ দিই। Bombay Talkies এ শ্রীনীতিন বসুর পরিচালনায় Double verson সমর ও মশালের সঙ্গীত পরিচালনা করি। এরপর "কারদারে" যোগ দিই; নওজোয়ান, বাজী, বাহার ছবিতে কাজ করি। কারদারে কাজ করবার সময় বাইরের দু একখানা ছবিতেও কাজ করতে হয়। মাদ্রাজী একখানা ছবিতেও কাজ করেছিলাম। আজ কাজ উপলক্ষে আমাকে বম্বে থাকতে হয়, অবসর একটুও পাইনে। কাজের নেশায় স্বাভাবত:ই মনটা কেমন যান্ত্রিক (Mechanical) হয়ে গেছে তবু বাঙলা দেশের কথা তবুও ভুলতে পারিনে—মন আমার বাঙলার গ্রামগুলিতেই পড়ে আছে আজও। তাই বাঙ্গালীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য আর তার সুরে বাংলার ছোঁয়া দিয়ে মন ভরি।*

* শ্রীলক্ষ্মণ বিশ্বাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—•—


# জাতির সেবায়

## সরকারপুল মানসিক হাসপাতাল

( তারাতলা )

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাহায্যপুষ্ট এই মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে সর্বাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমস্ত উপায়ে চিকিৎসা করানো হয়।

**গোবিন্দপুর বজবজ রোড, ২৪ পরগণা**

ফোন: ৪৫-৬৫৭৫ ও ৭৫-৮৪১১

# লেনিনের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের যোগসূত্র

এ. ভাসিলিয়েফ

[ সোভিয়েত রাশিয়ার মহান নেতা এবং মানবদরদী লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী ১৯৬৯ সালে। লোককাব্য নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই নিবন্ধটি প্রকাশ করলাম।—সম্পাদক ]

১৯১৭ সনে রুশ শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় ভারতের বহু দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁদের মনের উপর অকটোবর মহাবিপ্লব ও লেনিনের ভাবধারা সুবিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। রুশ বিপ্লব সম্পর্কে জানতে ও এই বিপ্লবের নেতা ভি. আই. লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ব্যগ্র কতিপয় ভারতীয় বিপ্লবী কুড়ির দশকে মস্কোতে এসেছিলেন। লেনিনের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎকার ও কথা বার্তা এবং অকটোবর বিপ্লবের নেতার প্রভাব সোভিয়েত ও ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাসে অন্যতম সর্বাধিক আগ্রহোদ্দীপক অধ্যায়।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামের প্রবক্তা ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধারা অকটোবর বিপ্লবের মধ্যে এরূপ সংগ্রামের প্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত রাশিয়াকে ভারতীয় জনগণের মিত্র বলে গণ্য করতেন। কাজেই বিস্ময়ের কিছু নয় যে, ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় বিপ্লবীরাই প্রথম মস্কোতে এসে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। ১৯১৯-১৯২০ সনে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন অধ্যাপক বরকতুল্লা, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ( স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ), রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, সৌকত উসমানি সহ কয়েকদল ভারতীয় বিপ্লবী। এই সাক্ষাতকার তাঁদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। বহু বছর বাদে ১৯২৮এর ২২শে এপ্রিল দিল্লীতে লেনিন স্মৃতিসভাতে মহেন্দ্রপ্রতাপ গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সেই সাক্ষাতকারের কথা স্মরণ করেছিলেন। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রবন্ধে সৌকত উসমানী লেনিনের চোখ দুটির ঔজ্জ্বল্য ও খোলা হাসির কথা উল্লেখ

করেছেন। তিনি একথা জেনে বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন যে, ১৯২১ সনের দুর্ভিক্ষের সময় উক্রাইনের কৃষকদের উপহার হিসাবে দেওয়া একটি খাবারের প্যাকেট লেনিন কারখানার শ্রমিকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ কাজের মধ্যে উসমানি অকটোবর বিপ্লবের মানবিক দিকটি দেখতে পেয়েছিলেন।

লেনিনের সঙ্গে আলোচনা রুশ বিপ্লবের পর পৃথিবীতে পরিবর্তনের প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ভারতীয় দেশভক্তদের সাহায্য করেছিল। প্রথমে তাঁরা ভারতে মুক্তি সংগ্রামের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার বৈষয়িক সাহায্য পাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লেনিন রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাদির ন্যায় বিষয়গুলির দিকে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯১৯ সনে বরকতুল্লা ও মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে লেনিনের সাক্ষাৎকার এ ব্যাপারে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রতিনিধিদলে বরকতুল্লার ভৃত্য ইব্রাহিমও ছিলেন। পাঞ্জাবের কৃষকদের অবস্থা নিয়ে লেনিন তাঁর সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে কথাবার্তা বললে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিস্মিত হয়ে যান। এটা মোটেই আকস্মিক ছিল না কারণ কৃষক সমস্যা সম্পর্কে লেনিন সব সময়ই বিরাট আগ্রহ দেখাতেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময়ও খুবই আগ্রহোদ্দীপক। দত্ত ভারতের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর থিসিস লেনিনের কাছে পাঠিয়েছিলেন জবাবে লেনিন লিখেছিলেন: "প্রিয় কমরেড দত্ত, আমি আপনার থিসিসটি পড়েছি। সামাজিক শ্রেণীগুলি নিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত নয়। ঔপনিবেশিক প্রশ্নে আমার থিসিসটিই আমাদের মেনে চলা উচিত বলে আমার মনে হয়। ভারতে যদি কোন কৃষক সমিতি থাকে তাহলে সেগুলি সম্পর্কে পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করুন।"

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, এই পত্রটি তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল। এটা তাঁর কখনো মাথায়ই আসেনি যে জাতীয় মুক্তি অর্জনে "কৃষক আন্দোলনের" গুরুত্ব এত বিরাট। বিষয়টি সম্পর্কে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্তির জন্য সংগ্রামের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত বদলে দিয়েছিল এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সত্যিকার দৃঢ় অবলম্বন সম্পর্কে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল এরপর তাঁর কাজ কর্ম সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতি গ্রহণ করল। ভারতে ফিরে এসে তিনি শ্রমিকশ্রেণী

ও কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী হয়ে উঠলেন। বস্তুত ১৯২১ সনে লেনিন তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারই পরিণতি হিসাবে তাঁর "ভারতে ভূমি অর্থনীতির ডায়লেকটিক্স" বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

আন্দোলনের মতাদর্শগত দিক নিয়েও লেনিন ভাবতেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন "প্রেম ধর্ম" পুস্তিকাটি লেনিনকে পাঠিয়েছিলেন লেনিন মহেন্দ্রপ্রতাপকে ভারতে ফিরে গিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের কথা প্রচার করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এতে ভারতে মুক্তির পথ সহজতর ও হ্রস্বতর হবে।

অন্যান্য বিপ্লবীদের, যেমন এম. এন. রায়ের প্রতিও লেনিন মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং তাদের অন্য ধরণের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন। রায়ের ক্ষেত্রে এই ভুল সীমাবদ্ধ ছিল সর্বোপরি জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখার মধ্যে।

১৯২০ সনে ভারতীয় বিপ্লবী সমিতির কাছে অভিনন্দন বার্তায় লেনিন বলেছিলেন যে, "মেহনতী জনগণের সংগঠন ও শৃংখলা তাঁদের অধ্যবসায় ও পৃথিবীর মেহনতী জনগণের সঙ্গে সংহতি" সংগ্রামের সাফল্যের একটি শর্ত।

বিখ্যাত বিপ্লবী ভগৎ সিং'এর বিবর্তন ভারতীয় দেশভক্তদের উপর লেনিনের ভাবধারা প্রভাবের একটি অতিশয় জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। লেনিনের ভাবধারার প্রভাবে ভগৎ সিং সংগ্রামের চক্রান্তমূলক পদ্ধতি থেকে সরে আসতে শুরু করেছিলেন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। জেলখানায় ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯২৯ সনের লেনিনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছিলেন। "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ" ও "লেনিন অমর হোন" শ্লোগান দিয়ে তাঁরা আদালতে হাজির হতেন। মস্কোতে পাঠাবার জন্য নিম্নলিখিত তারবার্তাটি রচনা করা হয়েছিল : "লেনিন দিবস উপলক্ষে মহামতি লেনিনের ভাবধারাকে সামনে এগিয়ে নিতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সবাইকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সোভিয়েত রাশিয়ায় যে বিরাট পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে আমরা তার সাফল্য কামনা করছি। পুঁজিতন্ত্র চলবে না। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।"

মৃত্যুর আগে ভগৎ সিং'এর কামনা ছিল : "আমি লেনিনের জীবনী পড়ছি, এটি যেন শেষ করে যেতে পারি।"

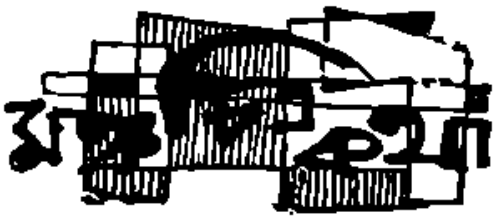

# চলচ্চিত্র ও সমাজ

ঋত্বিককুমার ঘটক

চলচ্চিত্র কখনও সমাজ বহির্ভূত হতে পারে না। যেটাকে আমরা সম্পূর্ণ সমাজ-বহির্ভূত ভাবি, সেটা পর্যন্ত কোন রকম ভাবে সমাজকে প্রতিফলিত করে। সর্বশিল্পই ভালোবাসার থেকে উদ্ভূত। ভালোবাসা ছাড়া কোন শিল্পই জন্মায় নি। মাইকেল এঞ্জেলো, বুঅনারিত্তির, সিসটাইন চ্যাপেল যা দেখে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ মুগ্ধ, যেখানে মানবজাতির ইতিহাস পরিপূর্ণ উদ্ভূত আছে রোম শহরে, তার থেকে আরম্ভ করে জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস,' সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশের ভিত্তি। আমাদের এ ছবিও তাই। যদি আপনারা অনেক দিন আগেকার ছবি 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' ( পোর্টার ) দেখেন, তার পরেতে যদি 'ইনটলারেন্স' ( ডি, ই, গ্রিফিথ ) দেখেন, যদি 'ব্যাটলশিপ অব পটেমকিন' ( সার্গেই আইজেনষ্টাইন ) দেখেন, যদি 'মাদার' ( পুডভকিন ) দেখেন,— সর্বত্র দেখবেন মানব জাতির প্রতি মায়ের মতো ভালোবাসা। সর্বশিল্পে যা, ছবিতেও তাই। ভালোবাসা হচ্ছে সর্বশিল্পের গুহ্যবস্তু। তাৎক্ষণিক তাৎপর্য মানুষ হয়তো বুঝতে নাও পারে কিন্তু একদিন বুঝবেই।

এর পরে আসে Technique। ওটা কিছু না। চাকর-বাকরও ওগুলো বোঝে। ওটা কোনও Pointই নয়। অনুভূতিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এবং সর্বশিল্প শেষ হয় গিয়ে কবিতায়। সেই কাব্যময় অনুভূতি যদি প্রাণের মধ্যে না আনা যায় তাহলে কোন বড় কাজ হয় না। ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যিক উত্তরণ ভীষণভাবে প্রয়োজন। ছবির ক্ষেত্রেও

তাই, যদি ছবিকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করার কোন চেষ্টা থাকে। আর ব্যবসা করার জন্যে তো মানুষজন অখাদ্য ঘটনা করছে, সেগুলো নিয়ে তো কোনও গম্ভীর আলোচনার অবকাশ নেই, তারা তা করেই যাবে এবং পয়সা পেয়ে যাবে। এ লোকগুলোকে কৃপা করা উচিত। এরা জানে না এরা কি হারালো! এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে এখন উদ্ধুচিত।

ঘটনাটা হচ্ছে, Film একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী মাধ্যম। এটাকে টেনে বের করে যে কত কিছু করা যায় তা বুঝিয়ে বলা আমার একটা ছোট্ট নিবন্ধে সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীতে যে কত রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, তার কোন ছোঁয়াই আমাদের পচা ভারতবর্ষে পৌছুচ্ছে না। এখানে সেই মান্ধাতার আমলের আস্তে বাজে ছবি করার ঝোঁক সবার। প্রথমতঃ গল্প বরবাদ হয়ে গেছে। এখানে চরিত্র এবং তার Developmentই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। গল্পের শেষ কেউ দেখতে চায় না কারণ জীবন অনন্ত, এর কোন শেষ নেই। মানুষের জীবনে একটা ঘটনা আসে আবার চলে যায়, এইটাকে ধরার ওদেশের লোকেরা চেষ্টা করছে। জাপানীরাও তাই করছে। আমরা খালি এই ভারতবর্ষে বসে গল্প তৈরী করছি, যাতে দু'টো মাইনে পাওয়া যায়, সংসার চালানো যায়। এই হচ্ছে আমাদের Tragedy। সব জেনে শুনে আমরা তলোয়ার দিয়ে দাড়ি কামাচ্ছি। বেশী আর কি লিখব বলুন? আপনারা যদি অবহিত হোন, তাহলে হয়তো এ দেশটাকে এখনো গুছিয়ে ভদ্র করে তোলা যায়। তা নইলে আমাদের শিল্পীদের কোন নিস্তার নেই।

—•—

ভারতের সেরা
চেসমী গ্লিসারিন সাবান
চেসমী কেমিক্যাল, কলিঃ

# নৃত্যের তালে তালে

বৈজয়ন্তীমালা

নৃত্যের সঙ্গেই আমার 'প্রথম প্রেম', রূপোলি পর্দায় আসবার অনেক আগে থেকেই আমি এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলুম। তখন আমি কত ছোট। তবু সারা মন জুড়ে আমার নাচন। তখনই নেচেছি রোমের ভ্যাটিক্যানে, তারপর আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সামনে।

ফিল্ম জগৎ-ই প্রথম আমাকে বিপুল এক জনসমষ্টির সামনে আমার নৃত্য পরিবেশনের সুযোগ দিয়েছিল। এই সব দর্শক কোনদিনই আমার মঞ্চে নৃত্যরত দেখেনি। হয়তবা দেখতে চায়ওনি। আমার সিনেমা জীবনের সুরুতে কিছু প্রযোজকরা হয়ত ভেবেছিলেন, আমি যতটুকু অভিনয় শিল্পী, তার চেয়ে অনেক বেশি নৃত্যশিল্পী। তাই তারা আমার নৃত্যনৈপুণ্য প্রকাশ করবার বেশি সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু যতদিন গেল, দর্শক সাধারণ আমাকে অভিনয় শিল্পী হিসাবেই এহণ করল ততই নৃত্যাংশটা ক্ষীণ ও গৌণ হয়ে এল।.....

ফিল্মে নাচ আর মঞ্চের উপরে নাচ—দুটোয় অনেক তফাৎ, অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে। আসলে আমি ধ্রুপদী রীতির নৃত্য ভারত নাট্যমের শিল্পী,—বহুবছর ধরে নৃত্যকলার এই শাখাটিরই আমি চর্চা করেছি। অথচ পর্দায় ধ্রুপদী নৃত্যের সুযোগ পেয়েছি কদাচিৎ। যারা হিন্দি ছবি দেখেন তারা বুঝবেন। ফিল্মের জন্য যে নাচ তৈরী হয় তা মিশ্ররীতির বিভিন্ন ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের ভঙ্গি ও মুদ্রা মিশিয়ে তৈরী; কখনও বা তার চালে পাশ্চাত্য-রীতির সুস্পষ্ট প্রভাবই থাকে।.....

সিনেমার নাচ আর কিছুই নয়—গানেরই একপ্রকার ব্যাখ্যামাত্র। সেই কারণে টারপসি কোরিয়ান্ আর্ট, বিশেষতঃ ভারতনাট্যমের মত কোন

রূপদী নৃত্যের যিনি প্রকৃত রসবোদ্ধা তাঁকে সিনেমার নাচ কখনই শৈল্পিক আনন্দের ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পারে না। চিরায়ত নৃত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য শিল্পগত দাবী এই কারণে আমাকে বিভিন্ন মঞ্চ-নৃত্যানুষ্ঠানে প্রণোদিত করেছে, এমনকি নবতর নৃত্যের উদ্ভাবনে শক্তি জুগিয়েছে।

মফস্বিলে নৃত্য ও অভিনয় যমজ বস্তু। আমি যে উভয়তই কিছু দক্ষতা অর্জন করেছি সে আমার সৌভাগ্য এসব আপনাদের আনুকূল্যে। আগের মত এখন আর কোন সমালোচকই বলেননা যে বৈজয়ন্তীমালা নৃত্য শিল্পী হিসাবে অভিনয়শিল্পীর চেয়ে বড়ো। অন্ততঃ আজ যখন তাঁরা আমার অভিনয় নৈপুণ্যের বিচার করতে বসেন তখন তার সঙ্গে আমার নৃত্যদক্ষতার তুলনা করতে বসেন না। তাছাড়া আজ পর্যন্ত বেশ কিছু ছবিই তো করলাম যেখানে আমি আদৌ নাচিনি।

কিন্তু যুগপৎ নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী হিসাবে একটা অপূর্ণ ইচ্ছা বা উচ্চাকাঙ্খা, যাই বলুন, আমার ছিল—পর্দায় ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পীর চরিত্র অভিনয় করব; মানে, আমি চেয়েছিলাম এমন একটি ভূমিকা যার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পাব নৃত্যের নির্বাধ ক্ষেত্র, অন্য দিকে তেমনি থাকবে অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের পূর্ণ সুযোগ। সত্যি, এমনই একটি ভূমিকা আমি পেলাম—প্রযোজক এফ. সি. মেহরা যখন আমাকে তার রঙীন চিত্র 'আম্রপালী'র ভূমিকায় আহ্বান করলেন।

—০—

Phone : 23-8904

With Best Compliments of :—

E. K. JESWANI & SONS

40-B, Princep Street, ( 1st Floor )

Calcutta-13.

## শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব

গত ৫ই সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা শিল্পীগোষ্ঠির দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে যোগদান করে আমরা খুশী হয়েছি। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সংস্থার সভাপতি শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন দে সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। এরপর নাচ, গান ও নাটক পরিবেশিত হয়।

একক নৃত্যে শ্রীমতী লীলা ভরদ্বাজ ও তার সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীতে শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী ভবানী চক্রবর্তী সকলের প্রসংসা অর্জন করেন। শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একাঙ্ক নাটক 'মিছিল' ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'শাপমোচন' পরিবেশিত হয়।

শ্রীসুভাস বসু রচিত "মেছিল" নাটকের নাম 'মিছিল' না হয়ে 'লটারী' দিলেই ভাল হতো অবশ্য এর জন্য শিল্পীগোষ্ঠীকে কোন দোষ দেওয়া চলে না। পরাগ দত্ত পরিচালিত 'মিছিল' মোটামুটি ভালই হয়েছে।

শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য নৃত্য পরিচালনায় ও শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত নির্দেশনায় 'শাপমোচন' দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। নৃত্যে শুক্লা দাস, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, নেলী সেনগুপ্তা, উর্মিলা বসু, ইন্দ্রাণী সেনরায়, রিতা দাস, শঙ্করী চক্রবর্তী, তৃপ্তি অধিকারী, বুলা ভট্টাচার্য্য, অনুসূয়া পাল প্রভৃতি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাঁশীতে কেদার নন্দী ও আলোক সম্পাতে শ্রীঅরুণ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

# যাত্রার আসর

নবকুমার শীল

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাত্রা অভিনয়ের আকর্ষণ বরাবরই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সাধারণ মানুষের চিত্তকে এক নির্মল আনন্দে ভরিয়ে রেখেছে। খোলামেলা বিরাট চত্বর ঘিরে আসর, ছোট্ট এক সামিয়ানার তলায় সাদা ফরাসের চারপাশে জুড়ি আর বাজনদার। দূরে সাজঘর থেকে একটা পথ আসরে এসে মিশেছে। হ্যাজাকের আলো কখনও কমছে আবার কখনও বেড়ে উঠছে। কৌতূহলী ছেলের দল মাঝে মাঝে উঁকি মারার জন্য ভীড় জমাচ্ছে সাজঘরের আশে পাশে। রংবেরঙের জরি বসানো জামা পড়ে মুখে রঙ মাখছে অভিনেতার দল। দলের যিনি কর্তা অর্থাৎ অধিকারী মশাই শশব্যস্ত হয়ে সব দিক দেখাশোনা করতে ব্যস্ত। কনসার্টের সুর চড়া পর্দায় আসর সরগরম করে চলেছে। কনসার্টের সুর একটু কমে আসতেই সরবে দীর্ঘ একটানা সংলাপ আওড়াতে আওড়াতে দ্রুতপদে আসরে প্রবেশ করলেন অভিনেতা। চারপাশের দর্শক নিস্তব্ধ হয়ে উপভোগ করার জন্য প্রস্তুত হোলো। সুরু হোলো পালা। গানে অভিনয়ে নাচে অভিনেতা ও দর্শক সবাই বিমোহিত ও পাশাপাশি। মাঝে মাঝে বিবেকের আবির্ভাব। গানে গানে চলে পালার বিশ্লেষণ। সারারাত ধরে চলে এক অকৃত্রিম আনন্দের যোগাযোগ। এই হোল যাত্রার নিখুঁত ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্তিকারের প্রাণের ছবি।

যাত্রার আসর বেশির ভাগই বসতো গ্রামে ও শহরতলীতে। কলকাতার শহরজীবনে যাত্রার রেওয়াজ ছিল খুব কম। বর্ষা শেষ হলেই যাত্রার দল বেরিয়ে পড়তো বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। দুর্গাপূজা, কালীপূজা থেকে আরম্ভ করে সরস্বতী পূজা ও ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যন্ত চলতো গাওনা। জমিদার বাড়ীতে, মেলায় বারোয়ারী মণ্ডপে

যাত্রার আসর বসতো। কৃষ্ণলীলা, দেবী মাহাত্ম্য, পুরাণের কথা, ঐতিহাসিক কাহিনী, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী,পাপ-পুণ্যের গল্প নিয়ে পালা রচনা হোতো। অভিনয়ের ধারা ছিল এক সুরে বাঁধা। মাঝে মাঝে চড়া গলায় আবার কখনও বিশেষ ধরণের ভঙ্গীতে সংলাপ বলা ছিল যাত্রার অভিনয় ধারার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। গানের প্রয়োগ যাত্রায় বেশী প্রাধান্য লাভ করতো ও গানের উপরই ছিল পালার জনপ্রিয়তা ও নামডাক।

যাত্রার জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বরাবরই আছে। বর্তমানে কালের গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে যাত্রার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ও নতুনত্বের সংযোজন হচ্ছে।

যুগ ও বর্তমান মানুষের রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাত্রা এখন বিরাট পরিবর্তনের মধ্য থেকে এক নতুন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। পালার বিষয়বস্তুর মধ্যে এখন স্বদেশীযুগের কাহিনী, হাল আমলের সামাজিক ঘটনা, কাল্পনিক ও অপ্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনীর সমাবেশ দেখা যাচ্ছে। যুগের সঙ্গে তাল রেখে এই পরিবর্তন যাত্রার মূল সুরটিকে অব্যাহত রাখার চেষ্টায় এখনও কোন শৈথিল্য দেখা যায়নি। যাত্রাকে যাত্রার ঐতিহ্য নিয়েই নতুন সাজে সাজতে হবে। মৌলিকতাকে বজায় রেখে নতুনকে গ্রহণ করার মধ্যেই শক্তির পরিচয়।

যাত্রা যেমন অতীতে জনগণের জীবনে বিচিত্র আনন্দের রসবোধকে বিশেষ ভাবে জাগ্রত করেছে তেমনি বর্তমানে এক নতুনরূপে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান যাত্রারদল আজও যাঁরা নিজেদের সুনামে পালাভিনয় করে চলেছেন তাদের মধ্যে প্রাচীন দল—নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি, সত্যাম্বর অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ আর্য অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা। এরপরে তরুণ অপেরা, নাটাভারতী, জনতা অপেরা, ভারতী অপেরা, শ্রীদা নাট্য কোম্পানী, কুণ্ডু নাট্য কোম্পানী, অম্বিকা নাট্য কোম্পানী। যাত্রার দলে নতুন দল হিসেবে মাধবী নাট্য কোম্পানী, শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী, সুশীল নাট্য কোম্পানী, বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ, কালকাটা মিলনবীথি অপেরা, নবলক্ষ্মী নাট্য কোম্পানী, রঙ্গ ভারতী, লোক নাট্যম এখন উল্লেখযোগ্য।

যাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামে জনশিক্ষার প্রসার ও দেশাত্মবোধের পালাগান অভিনয় হওয়া প্রয়োজন। যেমন মুকুন্দ দাসের যাত্রা এক সময় স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত করতে সাহায্য করেছিল। বর্তমানে দেশের মানুষকে বিভিন্ন বিদেশী রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হলে দেশাত্মবোধক, দেশের বিভিন্ন মনীষীদের চরিত্র ও জীবন কাহিনীর উপর রচিত পালা-গান পরিবেষণ করে যাত্রাকে লোকশিক্ষার অন্যতম প্রধান বাহনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে।

—•—


# বাংলার তাঁত বস্ত্র

**উৎসবে এবং নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করুন**

সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান

*** ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেট**

**৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা**

এবং

শাখাকেন্দ্র সমূহ

*** গভর্ণমেণ্ট সেলস্ এমপোরিয়াম**

**৭/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৮/১, বিধান সরণি, কলিকাতা,**

**১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা**

**১৮/এ, গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোড, ( সাউথ ) হাওড়া**

## তাঁত শিল্প

**বাঙালীর রুচি ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক**

**পশ্চিমবংগ সরকার প্রচারিত**

# অন্ধকারের ভেতরের অন্ধকারে

## সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের মেলামেশা, কথা সব বন্ধুর মতই আলো-অন্ধকারে মেশা। অফিস থেকে ঘরমুখো হলাম। অজগরের মত পথ অতিক্রম করতে করতে জীবন জিজ্ঞাসার কতগুলো কথা আমায় দংশন করতে লাগল।

চারিদিকে মানুষজন যে যার কর্মে মগ্ন। কেউ শ্লথ, কেউ গতিবান। তবু মনে হয় ওদের সবাইকে এক সুতোয় বেঁধে লাটাই ধরে আছে একজন।

বন্ধু সমীর একদিন আমায় বলল, যৌবনে প্রেম করা উচিত। তার অর্থ আমি যুবক। হ্যাঁ, আমার চুল পাকেনি, দাঁত নড়েনি। চোখ খারাপ হয়নি, বয়সটা দুইএর কোঠায়। সুতরাং উপদেশ কাজে লাগালাম। একটি মেয়ের প্রেমে পড়লাম। মেয়েটি সত্যি স্নিগ্ধতায় সুন্দরী। ডাগর চোখে শান্ত দীঘির আমন্ত্রণ। ভালবাসায় অনেক কারুকাজ। বন্ধু এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সে বিয়ে করেছে। তারপর যা যা করতে হয়—। সমীর আমায় জানিয়েছিল, আমি তার থেকে এবং অন্যের থেকে দেখে শুনে জেনেছি কিছু, দেয়া-নেয়া। এবং ফলে মেয়েটিও আমার প্রেমে পড়ল। প্রেমে পড়লে মেয়েরাও সব জেনে নেয়, শিখে নেয়। তাছাড়া একটা জানার জগৎ আছে আপন মনে। প্রেম করলেই যা যা হয় হতে লাগল। যা যা করতে হয় আমরা তাই করলাম, করতাম।

দিন মাসের বেশ কিছু ঢেউ আমাদের ওপর দিয়ে তরতর করে চলে গেল।

পাঠশালার গুরুমশাই ভক্তি করতে শিখিয়েছিলেন, কমলাপিসি ভয় করতে শিখিয়েছিলেন।

আমিও মা-বাবাকে ভক্তি করতাম, পণ্ডিতমশাইকে ভক্তি করতাম। কালী ও মা মনসাকে ভয় করতাম। সরকারী অফিসারকে ভয় করতাম। অপমানকেও ভয় করতাম। ভয় করলে কি কি করতে হয়, ভক্তি করলে

কি কি করতে হয় জেনেছিলাম। সেইভাবে চলছিলাম, অসুবিধা কোন ছিল না।

তারপর যৌবন, জীবনের ইচ্ছা, প্রেম, মেয়েটির কাছে আসা। তখন মেয়েটির বাবা আর আমার মা মেয়েটিকে বললেন 'তোমরা কর্তব্য পালন কর।' 'তোমরা দায়িত্ব পালন কর।'

সময়ে অনেক কিছু জানা যায়। আমিও জেনেছিলাম দায়িত্ব ও কর্তব্য কি। মেয়েটিও কিছু কিছু জেনেছিল। ফলে আমরা কর্তব্য পালন করতে, দায়িত্ব বহন করতে যা যা করতে হয় তাই করতে লাগলাম। অন্ধকারের বাসনায় আনন্দের আসঙ্গলিপ্সা। আমাদের একটি সন্তান হ'ল। মেয়েটি আমার স্ত্রী; সে বলল, ওকে স্নেহ করো। যেমনভাবে সন্তানকে স্নেহ করতে হয় সেইভাবে ওকে স্নেহ করতে লাগলাম।

সমীর আমায় কী যেন করতে বলল। আমি তাই করলাম। আমার মা আমাকে কি করতে বললেন, আমি তাই করতে লাগলাম। স্ত্রী আমায় কি সব বলল, আমি তাও করতে থাকলাম। স্ত্রীর পিতা আমায় কি করতে বললেন, আমি করলাম।

সমীর-আমার মিলিত সন্ধ্যা কোন একটি পার্কে। আলোচনায়, যুক্তিতে বন্ধুবর আমায় প্রত্যক্ষ করতে বলল—দেখো সংসারে কেন এসেছো, কি করছো—সেই একঘেয়েমি—আলোহীন এক যান্ত্রিক জীবন.....।

আমি হিসেব করলাম—

পণ্ডিতমশাই বললেন, ভক্তি করো, আমি ভক্তি করলাম।

বন্ধু বন্ধুত্ব করতে বলল। করলাম।

প্রেম করতে বলল। প্রেম করলাম।

মা বললেন কর্তব্য করতে। কর্তব্য করলাম।

স্ত্রী বললেন স্নেহ করো। আমি স্নেহ করলাম।

একজন বলল দয়া করতে। আমি দয়া দেখালাম।

কে যেন মায়া দেখাতে বলল। মায়া দেখালাম।

আরো কে যেন কি সব বলল। আমি কি সব যেন করলাম। মানে নানা করণীয় ব্যাপারে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে আমি নাকি বাধ্য। আমি ভক্তি, বন্ধুত্ব, প্রেম, কর্তব্য, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি করতাম। কোন ফাঁক নয়,

ফাঁকি নয়। সংসারের প্রয়োজনে সবেতেই ব্যাপৃত। ধ্যাৎ—তবু জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধি আছে, বাচ্চা হচ্ছে। মিছিল আছে, চাকরী নেই। প্রেম আছে, সুখ নেই। সুখ কি অভ্যাস? হ্যাঁ আমরা সব অভ্যাসের দাস। চক্রাবর্তন। সময় গড়ায়। এক সময় আমার স্ত্রী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী গেছে। ওর ভাল লাগে সেখানে। মা আমার গেছে মগরায় মামার বাড়ী।

সমীর তখন স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় গেছে। ছোটরাও মার সঙ্গে। বকু ও কাজল কাজে। আর কে যেন কি করছে। কে যেন কি করছে না।

কিছু ভাল না লাগার জালে আমি আবদ্ধ।

অন্ধেরাও সংসারে বাস্তবিক, খেলাটে। লক্ষনের বাড়ী গিয়ে দেখি সে উর্মিলার সঙ্গে হিসেব করছে পুজোয় শাড়ী কিনবে না রেডিও কিনবে। বিভূতি অস্থির; বউ বাপের বাড়ী গেছে। সলিল ব্যস্ত বাচ্চার দুধের জন্য। অনেকেই অনেক কিছু করছে। অনেকে অনেক কিছু বুঝি করছে না। কি যেন হয়েছে, কি যেন করা হয়নি।

আমি ঘরে ঢুকলাম। দেওয়ালে বল ছুঁড়লে ফিরে আসার মত ভাবনার তীর ফিরে ফিরে আমাতেই আসছে।

আমি নিশ্চেষ্ট। আমি অথৈ সমুদ্রে ভাবনার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি। কিম্বা বন্ধ দরজা খুলে বাইরে যেতে পারছি না। উঠলাম। খোলা দরজা বন্ধ করলাম। বন্ধ জানলা খুললাম। ক্রমে আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকল। তারপর অন্ধকার ঘন হ'ল। ঘরের সর্বাঙ্গে সে বিস্তৃত হতে লাগল।

অন্ধকারের ভেতরে অন্ধকার, তার ভেতরে অন্ধকার।

বন্ধ দরজা, জানলা খোলা, ঘর অন্ধকার।

টেবিল খালি, শূন্য বিছানা। খালি দেওয়ালে সব কিছু দেখা যায় না। ছাদ শূন্য। মেঝে শূন্য। স্ত্রী সব পরিষ্কার করে গেছে কি? চেয়ারটা কোথায়? দেখছি না। আমি তখন বিছানায় হাত, পা, মাথা সর্বস্ব দেহ নিয়ে শুয়ে থাকতে পারতাম। মেঝের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু কিছুই হল না। কিছু করা গেল না। কি যেন করার আছে অথচ—

ঘর অন্ধকার। আমি একা। অন্ধকারে পৃথিবী ডুবছে। অন্ধকারে ঘর ভরে যাচ্ছে। অন্ধকারের ভেতরে অন্ধকার। তার ভেতরে অন্ধকার।

দরজাটা বন্ধ। জানালাটা খোলা। এবার হয়তো জানালাটা বন্ধ হয়ে যাবে। দরজাটা খুলে যাবে। কি হবে?

অন্ধকার। আমি আছন্ন। হঠাৎ মনে হ'ল এবার কি যেন আরম্ভ হচ্ছে। আমি কি কিছু দেখতে পাবি! বোধ হয় দেখতে পাবো না। কি দেখবো জানি না। কিছু কি শুনতে পাচ্ছি! না বোধ হয়ত। কিছুই শুনতে পাবো না। অথচ একটা বোধ। কিছু বোধ হয় শুরু হবে। আমি নামছি না উঠছি? অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতরে অন্ধকার তার মধ্যে অন্ধকার। কালো আঁধার। আঁধারে আবৃত সব—।


৺শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন

*With Compliments from :—*

**N. L. Bhadra & Co.**

85, N. S. ROAD, CAL-1

Phone No. 22-5597

*A leading name in*
*Pharmaceutical Industries*
*&*

**Eastern Pharma Products**

**41/B, Paddapukur Road,**
**Calcutta-20.**

( ২৩৬ পৃষ্ঠার পর )

কৃতজ্ঞ হওয়াতে দোষ কি ? ওতে ক্ষতি তো কিছু নেই। বরং যথেষ্ট লাভই আছে। অন্য কারো লাভ নয়, নিজেরই লাভ। ওতে নিজের মন উদার হয়, নির্মল হয়, প্রসন্ন হয়, অন্তত ক্ষণকালের জন্যেও হৃদয় মন একটা বিমল আনন্দে ভরে ওঠে। আর ওতে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রেমের দিকে, উন্মীলনের দিকে, বিকাশের দিকে। বাইরে তা প্রকাশ না করলেও চলে, মনে মনে কৃতজ্ঞ হওয়া, তাতেই ভিতরে ভিতরে কাজ হবে।

একথা বুঝেই মা বলছেন—"For your heart to remain happpy, Keep it always filled with gratefulness;" হৃদয়কে সুখী করে রাখতে হলে সর্বদাই তাকে কৃতজ্ঞতায় ভরে রাখো। কিন্তু কেন কৃতজ্ঞ হবো, কারপ্রতি কৃতজ্ঞ হবো ? সেজন্য ভাবতে হবেনা, চেতনাকে একটু জাগিয়ে রাখলেই দেখতে পাবে যে জীবনের প্রতি ক্ষণে কৃতজ্ঞ হবার যথেষ্টই কারণ রয়েছে। ঘরের ও বাইরের মানুষের প্রতি প্রকৃতি ও দেবতার প্রতি, ভগবান ও বিশ্বমাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবার কতই কারণ থাকে। সব কিছুকে জড়িয়ে, সকলের সাহায্য ও অবলম্বন নিয়ে তবেই তো আমার এই আমি। আর কিছু না দেখা গেলেও এটা অন্তত দেখতে পাওয়া যায় যে প্রকৃতিও দেবতারা নিত্যই আমাদের সহায়তা করছে, নতুবা এই পৃথিবীতে টিঁকে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। বেদ উপনিষদের ঋষিদের যুগে যখন এমন ক্রাত্রমতা ছিলনা, তখন এ কথা তাঁরা সহজেই অনুভব করেছিলেন, এবং কৃতজ্ঞতার আনন্দে মুখর হয়ে ( মা যাকে বলেন joy of gratefulness) অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সবিতা প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে অমর স্তবগাথা রচনা করেছিলেন। এখনও আমরা আমাদের প্রতি মঙ্গলকার্যে সেগুলির আবৃত্তি ক'রে থাকি যদিও অর্থ বুঝিনা। ভগবানের বিভিন্ন অংশস্বরূপ দেবতাদের প্রতি ও সর্বোপরি নিত্য করুণাচেতন ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া তা অন্য কিছুই নয়। কেবল প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক দেবতাদের স্তবগান করেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেখেছেন যে কোন পরাচেতনা তাদের উদ্ভাবন করছে, কোন মহাজ্যোতির জ্যোতি পেয়ে এতাবৎ সকল কিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—তারই বন্দনা গানে তাঁরা মুখর হয়ে উঠেছেন। কৃতজ্ঞতা মূলের চেয়েও মূলে গিয়ে পৌঁছেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

# পশ্চিমবঙ্গ

এখন অনেক বেশী লোক পড়ছেন

বর্তমানে প্রচার-সংখ্যা ১২,০০০

| বিক্রয় সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে | |
|---|---|
| আগষ্ট, ১৯৬৬ ... | ৪৭৫ |
| আগষ্ট, ১৯৬৭* ... | ৫,৫৯৫ |
| আগষ্ট, ১৯৬৮ ... | ১,২৭৯ |
| আগষ্ট, ১৯৬৯* ... | ৯,৩৯১ |

( * যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে )

আপনিও নিয়মিত পড়ুন

প্রতি সংখ্যা : দশ পয়সা

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও নেওয়া হচ্ছে

বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি উপযুক্ত মাধ্যম 'পশ্চিমবঙ্গ'

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন

বা যোগাযোগ করুন :

বিজ্‌নেস ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

—প. ব. ( তথ্য ও জনসংযোগ ) বি ৩০০৬ শা. ৬৯—

# কবর

রঘুপতি বসু

বংশীটা কি ঠকানই না ঠকাত! অথচ তোর সঙ্গে কি আমাদের সেই সম্পর্ক, যে—শুধু ঠকিয়ে পয়সা নিবি! সব কাজেই একটা ন্যায় ধর্মতো আছে!—তা' তুই জোগাড় যন্তর কচ্ছিস, হিল্লী দিল্লী ঘুরছিস,—কে কোথায় আছে—তার খোঁজ করছিস—সে তো ভাল কথা,—তোর পয়সা তুই নে না। কে বারণ করেছে?—তবে হ্যাঁ, ন্যায্য পয়সা নিবি!

মদন বলত,—শালা মুর্দ্দাফরাস। এতদিন বাদে দেখা যাচ্ছে—সত্যি কথা। একেবারে টায় সত্যি। আরে বাবা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে,—নড়বেই। সে আজই হোক কিম্বা কালই হোক।

তবে হ্যাঁ,—কাজ যে কিছু করিসনি তা নয়—। তবু এই ফাঁকি ফক্কিকারী কেন?—এত ফাঁকি দিলে তোকে কে বিশ্বাস করবে! তাছাড়া বিশ্বাস করুক বা না করুক তোর ইজ্জতটা থাকে কোথায়—?—এইত সেবার—সেই কালী পূজোর পরদিন সে কি কাণ্ড! একেবোরে সকলের সামনে কি ইজ্জতটা গইল তোর?

নয়ন চাঁদ মল্লিক লেনের মোড়ে—গোপাল বাবুর বাড়ীর রকে দাবার আড্ডা জমেছে তখন। ভজন মাষ্টার আর বিশুকাকা খেলছে। দুপক্ষেই সোসাহেবের ভীড়। পাকড়াশী বাবু চুপ করে থাকতে না পেরে বিশুকাকাকে বললে—আহা-হা করছ কি,—গজে হাত দিচ্ছ কেন?

আর যায় কোথা। ভজন মাষ্টার ফোঁস করে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়েছে—ধ্যাঁ—একি হ'চ্ছে, আমি আর খেলব না।

পাকড়াশী বাবু একেবারে অপ্রস্তুত। বিশুকাকা মাষ্টারের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল—আহা রাগ কর কেন! ও সব কথা ছেড়ে দাও!

—ছেড়ে দাও—? তার মানে—?

বিশুকাকা বললে—আহা—আমি ত' আর ওদান দিই নি।

ভজন মাষ্টার বলল—তা বলে—

ঠিক এমনি সময়ে মোড়ের মাথায় হৈ হৈ কাণ্ড। গলা কাটানো চিৎকার শুরু হয়েছে—তবেরে শালা, খানকীর বাচ্চা—শালার মাকে.....।

কি হল, কি হল করতে করতে চারদিক থেকে লোকজন জমে গেল—। মদন তখনও দমাদ্দম এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে।

বিশুকাকা ভজন মাষ্টারের কথা ভুলে—পাকড়াশীবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল—ওহে পাকড়াশী, কি হচ্ছে দেখত।

ততক্ষণে দু একটা সাহসী ছোকরা এগিয়ে গিয়ে দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তড়পানি তখনও থামেনি—

—ছেড়ে দাও! শালা শুয়ারকা বাচ্চাকে আমি দেখে নেব।

আমার বুক পকেটের কাছটা ছিঁড়ে ঝলঝল করছে। বংশী বলল—দেখলেন ত'—আপনারা ভদ্দরলোকরা সকলে ব্যাপারটা দেখলেন—?

হংকার দিয়ে উঠল মদন—চোপ শালা।

ইতিমধ্যে মজা দেখার জন্য লোকের বেশ ভীড় জমেছে। মনে হচ্ছে লোকগুলো যেন দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল মদন আর অন্যদল বংশীকে সামলাচ্ছে—অথচ মনে মনে সকলেরই ইচ্ছে মারামারিটা জমিয়ে হোক। এধারে দাবা খেলাও বন্ধ। এবার ভজন মাষ্টারের দান দেবার পালা—কিন্তু ছকের দিকে কারোও নজর নেই।

পাকড়াশীবাবু রক থেকে নেমে একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার ওখানে?

আরে মশাই বলবেননা—যত্ত সব—লোকটা মুখ বাঁকাল।

মদন তেমনি সমানে খিস্তি করছিল। এবার ভীড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচাতে লাগল—আরে মশাই,—কাল সন্ধ্যেবেলা শালা আমার কাছ থেকে নগদ করকরে তিনটে দশ টাকার নোট গুনে নিল। আর—রাত দশটায় এক বোতল কালীমার্কা খাইয়ে আমায় বেহুঁশ করে,—মশাই,—সারা গায়ে পাঁচড়া-ওলা এক বুড়ীর ঘরে তুলে দিয়ে এসেছে। আমি মশাই—সাদাসিদে সরল লোক—সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে নেশা ছুটে গিয়ে ঘেন্নায় মরি!—এমন শয়তান শালা কুত্তার বাচ্চা!

বংশী বলল—দেখলেন—? আপনারা দেখলেন ? তোর পছন্দ তার আমি কি করব। আমি কি তোকে জোর করে গছিয়েছি ?—হ্যাঁ মশাই, আপনারাই বিচার করুন না—বাজারের খানকী কি আমার ঘরের মাগ !

মদন হুঙ্কার দিয়ে উঠল —চোপ শালা ! ফের কথা বলবি ত' টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব।

কিন্তু বংশীটাও এক নম্বর হারামজাদা—। বলল—দেখলেন ? দেখলেন—ভালবাসার ফল।

তা' ভালবাসাই বটে !—আবছা অস্পষ্ট ঘোলাটে আলোয় অল্প বয়সী ডবকা বেশ্যা মাগীর তেলচিটে বিছানায় বসে ভালবাসার কথা ভাবতে ভাবতে হাসি পাচ্ছিল পিনাকীর। এ পর্যন্ত বংশী সরকার কত জনকে যে ভাববেসে বেশ্যা বাড়ীর গাদে খাইয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। আর—শালা এমন ধুরন্ধর যে—নেশা না পাকিয়ে কারোও ঘরে তুলবে না। নেশায় চুর হলে তারপর কোথাকার গ্রে ষ্ট্রীটের কোন বুড়ি শকুনির বাসায় নিয়ে তুলবে। মদনটা ঠিকই বলে—ও শালা এক নম্বরের মুর্দ্দাফরাস। যত মড়া নিয়ে ওর কারবার। টাকা দেড়েক বুড়ীগুলোর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বাকী সবটাই শালা নিজে মেরে দেয়।

আরে বাবা তোর যা খরচা তা নে না,—কে তোকে বারণ করেছে ? যা ন্যায্য হয় নে। কিন্তু এমন বাজে পচা মাল দিস যে গা গুলিয়ে ওঠে। সারা গা ময় দাদ, ছাজা, চাকা চাকা গরমির দাগ। ঘেন্নায় বমি উঠে আসে।

আজ কিন্তু দেখে শুনে বাছাই করে নিয়েছে পিনাকী। একটু অস্বস্তি যে যে লাগছিল না তা নয়—তবু অত কাঁচা ছেলে নয় সে। বাজিয়ে নিয়েছে। ডবকা—নিটোল—বেশ চকচকে লাগছিল ছুঁড়িটাকে। মনে হয় বেশ সুস্থ সবল ; অন্তত পিনাকীর তাই মনে হয়েছে। গালে যদিও খুব করে রং মেখেছে—তবু কোন দাগ টাগ আছে বলে মনে হয় না। কথা বার্তাও মন্দ নয়। কাছে পিঠের দোকান থেকে কালী মার্কা বোতল আনতে গেছে। ফিরে এলে খুটিয়ে সব দেখে নেওয়া যাবে।

বংশী বলল—ছাখ শালা, যেদিন নিজের পয়সায় একা মদ খাবি আর লুকিয়ে লুকিয়ে মাগী বাড়ী যাবি—বুঝবি সেদিন তোর শিক্ষা শেষ হয়েছে—

তুই লায়েক হয়েছিস। কথাটা সেদিন ঠিক বোঝা যায়নি—এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে। একা আসতে সত্যিই সাহসের দরকার। প্রথম প্রথম বুকটা যেন ধুক্ ধুক্ করছিল। নেশা ছাড়া সাদা চোখে ভয় করারই কথা—সত্যি কথা বলতে কি পিনাকীর খুবই ভয় করছিল। মাগীটাকে দেখে নেশা ধরার পর তবে সাহস এসেছে মনে। অথচ সেই কখন দোকান থেকে মদের বোতল আনতে গেছে মাগীটা,—এখনও ফিরল না। নিজের মনে বিড় বিড় করে ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাল পিনাকী। বসে বসে পনেরো মিনিট কেটে গেছে—।

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। একা একা বসে থেকে এবার সত্যিই অস্বস্তি লাগছে পিনাকীর। ঘরের ভেতরের হাওয়াটা যেন বড্ড বেশী ওমোট। ডান হাতটা তুলে কপালের ওপর ছোঁয়াল সে। সারাটা কপাল ঘেমে উঠেছে। কানের পাশ ঘেঁসে এক ফোঁটা ঘাম আস্তে আস্তে নিচে নামছে। পাঞ্জাবীর ডান পকেট থেকে রুমাল বের করল পিনাকী; ঘসে ঘসে ঘাড় কপাল আর মুখ মুছল।

এভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে! পঁচিশ পাওয়ারের তুসো পড়া বালবের আলোয় ছ হাত বাই আট হাত ঘরখানাকে এবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল পিনাকী। দরজার পাশে বা দিকের দেয়াল ঘেসে লাল রঙের টিনের বাক্স—ওপরে ফুল আঁকা। তার ওপর খালি কাঁচের গ্লাস। চটা ওঠা দুটো কাপ ডিস। আম কাঠের নড়বড়ে খাটের ওপর তেলচিটে বিছানা। খাটের পায়ের দিকে ঘরের কোনে পুরোণো মাদুর গুটিয়ে দাঁড় করান রয়েছে। বিছানার সামনা সামনি দরজার মাথার পটে আঁকা কালীঘাটের কালীর ছবি—ফ্রেমের কোনে জলন্ত ধুপ কাঠি গোঁজা। কি ধুপ কে জানে! ঘরের মধ্যে ধোঁয়ার অস্পষ্টতা রয়েছে, তবু ভেতরকার ওমোট ভ্যাপসানি গন্ধ যায়নি। দরজার ডান দিকে—কোনাকুনিভাবে তার টাঙান। তাতে আধ ময়লা দু'তিনটে কোঁচান সাড়ী আর ব্লাউজ ঝুলছে। সারা ঘরের বিবর্ণ দেয়াল জুড়ে স্যাঁৎ সেঁতে ছাতা পড়া ড্যাম্পের দাগ।

একা বসে থাকতে থাকতে আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল পিনাকীর। এতক্ষণ ধরে মাগীটা কি করছে কে জানে!

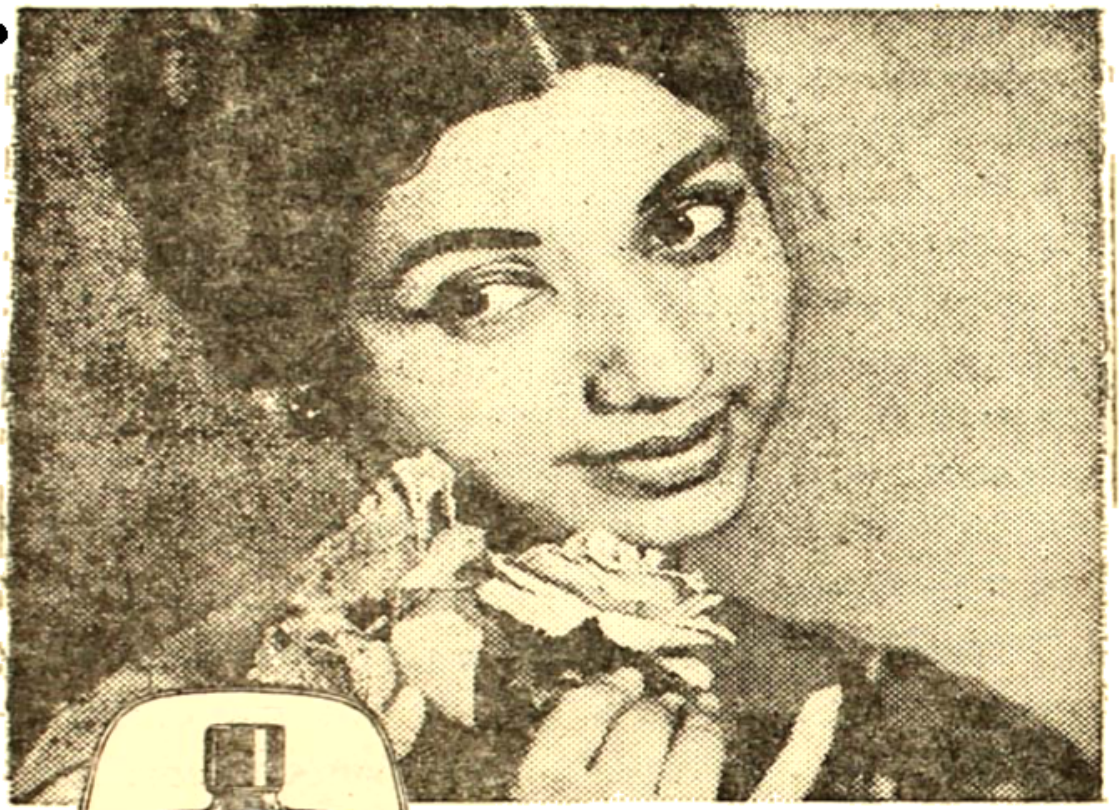

# কান্তা স্নুগন্ধি

*আপনার মনোরঞ্জনের*
*মন্ত্র জানে*

কান্তা সুগন্ধি মেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সদ্যফোটা ফুলের এত আপনি সৌরভ ছড়াবেন। আপনি পাশ দিয়ে গেলে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হবে; আপনাকে সকলেই মুগ্ধনেত্রে দেখবে। হয়ত তেমন কারো দর্শনও মিলে যেতে পারে—যার কাছে সেই মধুগন্ধে হৃদয়ে অক্ষয় আসন পাবেন মধুর শ্রীময়ী আপনি!

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

JWTCCKA 2998

ঘরের জানলা দিয়ে বিকেলের আগুন দেওয়া উনুনের ধোঁয়াগুলোকে ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে যেতে দেখে মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হলও। এত নোংরা লাগছে ঘরটা! ভ্যাপসা গুমোট গন্ধটাকে অসহ্য মনে হচ্ছে। নোনা ধরা দেয়ালময় গরমির দাগের মত চাকা চাকা দাগ। সেবার গান্ধীজীর জন্ম দিনের ছুটিতে বংশী মেটেবুরুজের যে মাগীটাকে ঠিক করেছিল—সারারাত তার সঙ্গে কাটিয়ে ভোরের আলোয় তার মুখে ঠিক এমনি চাকা চাকা বীভৎস দাগ দেখে খেয়ায় তিনদিন তিন রাত্তির গা ঘিন ঘিন করেছিল পিনাকীর। এই ঘরটার নোনা ধরা দেয়ালময় ঠিক সেই রকম দাগ। আশ্চর্য অদ্ভুত অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে ঘরটাকে। নোংরা সাড়ী, ছ্যাৎলা পড়া দেয়াল, ঘোলাটে পঁচিশ পাওয়ারের বালবের আলো—সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে পিনাকীর খুব গা ঘিন ঘিন করছে।

সামনের দেয়ালে টাঙান মা কালীর ছবির ফ্রেমে কোনে আটকান ধূপটা পুড়ে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঘোলাটে আবছা আলোয় পটে আঁকা কালীর ছবিটাকে ক্রমশ যেন ভীষণ হিংস্র মনে হচ্ছে পিনাকীর। তার নীচে ভিজে ভিজে স্যাঁৎস্যাঁতে দেয়ালে বহুদিনের পচা পুরোনো রক্তজমা দগদগে ঘায়ের মত খয়েরী রঙের বিবর্ণ সিঁদুরের দাগ।

ঘরের ভেতর চারদিকে ঘাড় ঘোরাল পিনাকী। কোথাও কিছু আশার, কোথাও কিছু আনন্দের চিহ্ন মাত্র নেই। জানালার ওপরে—আগাপাশতলা ধোঁয়ায় ঢাকা বাকী চোরা গলিটাও এর মধ্যেই জমাট বাঁধা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। ঘরের বাইরে বা ভেতরে কোথাও যেন পরিচ্ছন্নতা নেই। চতুর্দ্দিক গুমোট করা নিস্তব্ধতার মধ্যে বাছাই করে পছন্দ করা মেয়ে মানুষের তেলচিটে আটাসে নোংরা বিছানায় দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় বসে থেকে পিনাকী নিজেকে ভীষণ একা আর নিঃসঙ্গ বলে অনুভব করল।

বংশী বলত—বেস্যা মাগীর আমার ভালমন্দ কি রে? তুই কি জানাই হতে যাচ্ছিস? তোর কথা হল যত্ন আত্তি নিয়ে। ছুড়ীই হোক আর বুড়ীই হোক খাতির করলেই হ'ল; তোকে ভোলাতে পারলেই হ'ল। আর কাজ হয়ে যাবার পর নিজের সুন্দরী বৌকেও তো ভাল লাগে না—তা

বাজারের মাগী তো কোন ছার। পিনাকীর মনে হ'ল—তার বাছাই করা মেয়ে মানুষের চালচলনের সঙ্গে বংশীর দেওয়া গ্রেস্ট্রীটের সেই পুরোণো গরমির দাগে ভরা মুখওয়ালা বুড়ী বেশ্যাটার যেন কোন তফাৎ নেই। মেটেবুরুজের খোলার চালের বস্তিতে যে মেয়ে মানুষটার ঘরে সারারাত রমি করে ভাসিয়েছিল পিনাকী তার কথাও মনে পড়ল। হাড়কাটার প্রায় রাতকানা বুড়ীটার কথাও। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে এখন। নিজের মন থেকে এই ভয়টাকে না তাড়াতে পারলে—বোতলের দাম আড়াই টাকা, কাজের দরুণ পাঁচ টাকা আর যাতায়াতের ভাড়া বাবদ পঁচাত্তর পয়সা ;—মোট এই আটটাকা চার আনা জলে যাবে। এতগুলো পয়সা লোকসান দেওয়া সত্যিই কষ্টকর। ভয়টাকে তাড়াবার জন্য পিনাকী বার বার দেখা ঘরটাকে আর একবার মুখস্থ করার জন্য দেয়ালের ওপর চোখ রাখল।

মাথার ভেতরটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। ছেলেবেলায় সার্কুলার রোডে মামার বাড়ীর দোতলার জানলায় বসে বসে কতদিন ক্রীশ্চানদের কবর খানাটাকে দেখেছে পিনাকী। সন্ধ্যে হলেই বড় রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করে রাখত ও। রাত্তির বেলা হঠাৎ ভারী ট্রাক কিম্বা ট্যাক্সির হর্ণে ঘুম ভেঙে গেলে ভীষণ ভয় লাগত কবর খানাটার কথা মনে করে। দাদু বলতেন—কবরখানার শোয়ান লোকগুলো নাকি শেষ বিচারের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ঘরের আবছা অস্পষ্ট ঘোলাটে আলোয় চাকা চাকা গরমির দাগের মত ভিজে ড্যাম্পের দাগগুলো দেখতে দেখতে পিনাকীর মনে হল গ্রেস্ট্রীট, হাড় কাটা, চীৎপুর মেটেবুরুজ,—মায়—সারা কলকাতার অক্ষম অসুস্থ আত্মীয় পরিজনহীন বুড়ি বেশ্যাগুলো যেন এই ঘরের দেয়াল জোড়া কবরখানায় শুয়ে শেষ বিচারের জন্য দিন গুনছে। ইঁট পাথর আর সিমেন্টে বাঁধান কবরের ওপরে পাথরে কোঁদা দেবদূতের মূর্ত্তির মত মনে হচ্ছে দেয়ালে টাঙান পটে আঁকা কালীর ছবিটাকে। পিনাকীর মনে হল—তার ভীষণ ভয়ের জায়গা—ছেলেবেলাকার সেই কবরখানায় কে যেন তাকে বসিয়ে রেখে গেছে।

অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হারমোনিয়মের সংগে গলা মেলান গানের সুর শুনতে পেয়ে পিনাকী ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে

পেল। বাইরে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ রুক্ষ খন্‌খনে মেয়েলী গলায় কার হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাশের ঘরে কে যেন হোরাক হোরাক করে বমি করছে। আবছা আলো আঁধারি গুমোট ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে অপেক্ষা করে বসে থাকা পিনাকী সেই হাসির শব্দ, সেই গানের সুর, সেই বমির আওয়াজ—শুনতে শুনতে ভয়ে আর ঘেন্নায় হিম হয়ে যাবার আগে শেষবারের চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে তার বাছাই করা মেয়ে মানুষের ময়লা, নোংরা, তেল চিটে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—। তারপর—এক পা' দু'পা করে এগিয়ে গিয়ে কোনরকমে বন্ধ দরজাটা খুলে বাইরের খোলা হাওয়ায় ঝাঁপ দিল।

## গান্ধী শতবার্ষিকী

এবছর মহাত্মা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 'জাগরী'র পরবর্তী একটি সংখ্যা গান্ধী শতবার্ষিকী সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক


বাংলা কাব্য সাহিত্যের সনেট শাখায়
উল্লেখযোগ্য সংযোজন

রঘুপতি বসুর

# "চোখ চেয়ে মুখ"

জাগরী প্রকাশনী
কলিকাতা-৩

# নারী-তীর্থ

## নারী প্রগতির কথা

ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্পর্কে আধুনিক নারী সমাজের অজ্ঞতা ও অনীহার ঘোর না কাটলে যথার্থ নারী প্রগতি সম্ভব নয়। নারী প্রগতির আসল কথা হলো সার্থকতম womanhood গড়ে তোলা। নইলে গতানুগতিক প্রগতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান নারী হওয়া সত্ত্বেও আসমুদ্র হিমাচলে নারী প্রগতির সামনে সমস্যার পাহাড় আগের মতই রয়ে গেছে।

রবীন্দ্র সরোবর, দিল্লীতে রবীন্দ্র নাট্যশালায় নারী নির্যাতনের ঘটনা যে দেশে ঘটে সে দেশে নারী প্রগতির দুর্গতিকে কে রোধ করতে পারবে? নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলা তথা ভারতের আধুনিক নারী সমাজকে গর্জে উঠতে দেখিনি। অথচ মা কালীর দেশ, পদ্মিনীর দেশ, ঝান্সীর রাণীর দেশ ভারত। কেতাবী বীরাঙ্গণার কথায় আর কত কাল তাল দিয়ে চলা যাবে?

পাশ্চত্য সভ্যতার মোহে সম্প্রতি নারী সমাজ যে নক্কার জনক পথে পদচারণা করছে তা এক অর্থে ভাবনার কথা। এই যদি নারী প্রগতির লক্ষণ হয় তাহলে বলতেই হবে আমরা মরীচিকার পিছনে ছুটছি। পথে ঘাটে, স্কুল-কলেজে, সংসারে, সভায়—সর্বত্র নীতি বিগর্হিত ও অশুভ শক্তি প্রভাবিত নারী প্রগতির আস্ফালন। রান্নাঘর ঘর থেকে মুক্তি পেয়ে নারী সমাজ যে প্রগতিকে ধারণ করার কথা ছিল তা হয়নি। আর তার ফলে সমাজের কদর্যতা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

দেবযানী

ভারতীয় নারীর আদর্শে নারীকে হতে হবে মনে প্রাণে দেশে পরিশুদ্ধ। হতে হবে তাদের শক্তিময়ী ও শিক্ষিতা। মা কালীর যে ভাব মূর্তি আমরা কল্পনা করি—প্রয়োজন হলে বর্তমান নারীকে সেই মূর্তি ধারণ করতে হবে। সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার, সংসার ও সমাজের বনিয়াদ হলো নারী। এই নারী যদি বিপথগামিনী হয়, ভ্রষ্ট হয় তাহলে কিছুতেই সংসার ও সমাজের সুস্থতা আসতে পারে না। গৃহধর্ম, জননী পদ নারীর কাছে মহা সম্মানের জিনিষ। ভারতীয় সমাজ নারীকে মাতৃপদের জন্য শ্রদ্ধা করে এবং ভারতীয় নারীর আদর্শ বর্তমানে সমস্ত জর্জর পাশ্চাত্য দেশগুলিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিচ্ছে।

বর্তমানে সংসার ও সমাজের শত কোলাহল ও হলাহল দূর করতে পারে একমাত্র যথার্থ প্রগতিশীল নারী সমাজ। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার সমাহার ঘটিয়ে তাই জীবনে ধারণ করতে হবে নারী সমাজকে। নারী প্রগতির সামনে সব সমস্যা তাও দূর হবে এতে করে। ভারতীয় নারীর আদর্শ, বৈদিক যুগের বিদুষী মহিলাদের পথ লক্ষ্য করে নারী সমাজ যদি এগিয়ে যায় তাহলে সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটবে। সুখী গৃহ কোন তৈরী হবে, দেশও সমস্তদিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। নারী প্রগতির সামনে সমস্ত সমস্যার পাহাড় এক লহমায় তখন দূর হয়ে যাবে।

---

# জাগরী পড়ুন !
# জাগরী পড়ান !!
# জাগরী পড়তে বলুন !!!

# ফরেষ্ট রেঞ্জার

কংকণ বসু

সংরক্ষিত বনভূমি ! অসংখ্য বৃক্ষের
ছিন্ন দীর্ঘ শব রেখে—কাঠুরেরা ফিরে
গেছে কবে ! নির্বিকল্প···নিঃসঙ্গ তিমিরে
দেবদারু এ হৃদয় ! কোন্ কাঠুরের
মেয়ে তুমি— ? মধ্যরাতে সুতীক্ষ্ণ কুঠার
চালাও নির্মম হাতে ! আমি ত' এখন
মৃত—শাখা···কাণ্ড···মূলে ;—কোনো প্রয়োজন
ছিলনাক'—এ নির্দ্দয় সহৃদয়তার ।

*　　*　　*　　*

ছাখ ;—আমার অচিন্ত্য দুঃখগুলো জমে
উত্তুংগ পর্বতচূড়া,—মরশুমী ঝড়
সর্বাঙ্গে ধ্বংসের চিহ্ন এঁকে গেছে । বড়
দেবী হ'ল ;—জাননা কি—? কিনেছে নিলামে
ঠিকাদার বিষণ্ণতা এই বনভূমি
বহুকাল !—কোন কাঠুরের মেয়ে তুমি ?

—•—

## তুমি নদী আমি বন্যা

কুমারেশ চক্রবর্তী

তোমার দেহে গাঙের ঢল দেখেছি
দেখেছি সাগরের ঢেউ
কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
তোমার কাঁধে, বুকে, পিঠে।
এই মুহূর্তে জড়িয়ে পড়েছ তুমি
আমার প্রতিটি অনুভূতির সাথে,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তোমাকে
নিশ্বেস করার বাসনা।
নির্জনে ঘর নিভৃত রাত
শুধু তুমি আমি একা—
বন্যা!
তুমি হও নদী, আমি বন্যা।

## শুধুই সর্ব্বনাশ

লক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস

নেই তো সেদিন বাঙলা দেশের সুদিন যাহার বলতে পারো
আজকে যে ভাই তোমরা সবাই সকল কাজেই কেবল হারো।
স্বাস্থ্য কোথায় আগের মতন বীর্য কোথায় মনের বল,
অর্থ কোথায় বাঙলা দেশের ঝরছে কেবল চোখের জল।
কোথায় শস্য শ্যামল দেশে মাঠ ভরা সেই সোনার ধান
কোকিল দোয়েল শ্যামার মুখে যায় না শোনা মধুর গান।
খাল-বিলে নেই জলের আভাব শুকনা দেশ দেয় না ফল
শীতল বাতাস বয় না তো আর ঝরছে শুধু চোখের জল।
কান্না ভরা তাই এ চোখে পূজোর খুশি নেই তো আজ
কেমন করে কার পাপে মা ঘটল এমন সর্বনাশ॥

# সবারে আহ্বান জানাই

'জাগরী'র ১৫ বছর শুরু হচ্ছে পরবর্তী কার্তিক সংখ্যা থেকে। দীর্ঘ ১৪ বছরের যাত্রায় বাংলা সাহিত্যে নবতম জীবনবোধের বোধনমন্ত্র উচ্চারণের গৌরব ও কৃতিত্ব 'জাগরী'র সহযোগীদের—তাদের জন্য তাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে তাদের স্মরণ করিয়ে দিই—আদর্শ লক্ষ্যে এখনও পৌঁছা যায়নি। শিল্প দিব্যজীবনের জন্য—এ মহা-আদর্শ শিল্প-সাহিত্যে বাস্তবায়িত করার জন্য আহ্বান জানাই। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়—বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'জাগরী'র বক্তব্য তুলে ধরার যোগ্য। মহান্ত পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ জাগরীর সমস্ত প্রচেষ্টার উৎস। তাঁর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে সবাইকে ১৯৭২ সালে শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য জন্ম শতবর্ষে মহাসম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানাই। মহাসাগরের তীরে মহাশক্তি-ময়ী জননীর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য আহ্বান জানাই।

—সম্পাদক

---

সম্পাদক—শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা

সম্পাদক কর্তৃক বসাক ট্রেডিং কোং, ৩০, রাজকুমার মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৩৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৯/এ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ৫৫-৬০৩৩

## এই তব শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কন্যাপ্রতিম প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কলি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জন-সাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁরই উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, [illegible]

JAGARI Oct. & Nov. 1969 Reg. No. C314

দাম একটাকা

ভারতের তিনটি প্রভাবশালী পত্রিকা

# "আনন্দবাজার পত্রিকা"

ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা।

# "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড"

জনপ্রিয়, প্রগতিশীল, ইংরেজী দৈনিক।

# "দেশ"

সর্বাধুনিক প্রচারিত বাংলা সাপ্তাহিক।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিঃ

৬, প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

তার: আনন্দবাজার ফোন: ২৩-১২৮০ (৭টি লাইন)